প্রথম অধ্যায়

বাংলা সাহিত্যে শিবরাম চক্রবর্তী

শিবরাম চক্রবর্তী (১৯০৩-১৯৮০) বাংলা সাহিত্যে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে আবির্ভূত হয়েছিলেন। হাসির গল্পকার হিসাবেই তাঁর সর্বাধিক পরিচিতি। অথচ এক সময় তিনি বাংলা সাহিত্যের একজন সিরিয়াস লেখক ছিলেন। এমনকি প্রায় সব শাখাতেই সিরিয়াস সাহিত্যিক হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেলেও বেশ কিছুদিন পরে তাতে ইতি টেনে হাস্যরসের ধারায় নিমগ্ন হওয়ায় তাঁর সিরিয়াস সাহিত্যের আদ্যন্ত পরিচয় ও তার মূল্যায়ন হয়নি বললেই চলে। ফলে সাহিত্যিক শিবরাম চক্রবর্তীর যথার্থ পরিচয় নিরূপণ করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। বাংলা সাহিত্যের প্রায় সব শাখায় বিচরণ করে হাস্যরসের ধারায় নিমগ্ন হয়ে হাসির লেখক তকমায় বিভূষিত শিবরাম 'ছোটোদের লেখক' বা 'শিশুসাহিত্যিক' হিসাবে যে পরিচিতি লাভ করেছেন তা যে তাঁর যথার্থ পরিচয় নয়, আংশিক তথা অসম্পূর্ণ পরিচয়, পর্যায় ক্রমে স্বতন্ত্রভাবে তাঁর বৈচিত্র্যময় সাহিত্যিক প্রতিভার পর্যালোচনা করলে সহজেই বিষয়টি পরিস্ফুট হয়ে উঠবে।

ক) কবি শিবরাম

সাহিত্য জীবনের সূচনালগ্নে অনেক সাহিত্যিকই যৌবনাবেগে এবং যৌবনাবেশে কম-বেশি কাব্য-কবিতায় লেখনী শক্তির পরিচয় তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়ে থাকেন। কালক্রমে প্রত্যাশিত সাফল্য না পেয়ে কিংবা অন্য কোনো কারণে রচনাকর্মের মধ্যে সার্থকতা খুঁজে না পেয়ে কাব্য-কবিতার জগৎ পরিত্যাগ করেন। ত্যক্ত সাহিত্যকর্ম তখন স্থান লাভ করে সাহিত্যের ইতিহাসে, আত্মজীবনী বা জীবনীগ্রন্থে এবং রচনাবলির পরিশিষ্টে। কিন্তু কালের স্রোতে হয়তো বা সেই সমস্ত কাব্য-কবিতা খড়কুটোর মত ভেসে যায় পাঠকের মন থেকে। অনেক সময় সাহিত্যিক নিজেও তাঁর পরিত্যক্ত কবিজীবনের কথা মন থেকে মুছে ফেলতে প্রয়াসী হন। তাই পরবর্তী পাঠক প্রজন্মের কাছে সেই সাহিত্যিকের সাহিত্যজীবনের উন্মেষলগ্ন বিস্মৃতির অন্তরালে থেকে যায়। যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রয়েছে সাহিত্যিক অক্ষয় কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬) এবং সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-১৮৯৪) সাহিত্য জীবনে। শিবরাম চক্রবর্তীর সাহিত্যজীবনও শুরুই হয়েছিল কবিতা দিয়ে এবং তিনি প্রতিষ্ঠাও পেয়েছিলেন কবি হিসাবে। 'ভারতী', 'বিজলী', 'ভারতবর্ষ', 'কালিকলম', 'উত্তরা', 'কবিতা', 'দেশ' প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য পত্রিকায় তাঁর কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। বৈচিত্র্যময় কবিতায় তাঁর কবি প্রতিভার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল। ফলে কবি শিবরামের যথার্থ মূল্যায়ন অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। বাংলা

সাহিত্যে তাঁর আদি পরিচয় কবি হিসাবেই।

শিবরামের কাব্যচর্চার যথার্থ সূচনা হয় বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে। বাংলা কবিতায় তখন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবিসংবাদিত প্রভাব বর্তমান। তারই মধ্যে একদিকে রবীন্দ্রানুরাগী কবি সত্যেন্দ্র নাথ দত্তের অকাল প্রয়াণ (১৯২২) ঘটে, অন্যদিকে ''অগ্নিবীণা''য় নব সুর সংযোজনা করে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের আবির্ভাব হয়। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল রবীন্দ্র বিরোধী কাব্য চর্চার প্রয়াস। কৃষ্ণ ধর শিবরামের বাংলা কবিতায় আবির্ভাবের কথা ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছেন —

''রবীন্দ্রনাথ তখন দেদীপ্যমান। ধূমকেতুর মতন আবির্ভূত হয়েছেন নজরুল ইসলাম। কল্লোল ও কালিকলম গোষ্ঠীর লেখকেরা এই দুই ধারার কবিতা থেকে সরে গিয়ে সাহিত্যে নিও-রিয়ালিজম ও দেহবাদের দিকে ঝুঁকেছে। শিবরামের কবিতায় তার প্রতিধ্বনি ক্ষীণ শোনা যায়। কিন্তু তার চেয়ে বেশী করে মনে পড়বে নজরুল ইসলামের বলিষ্ঠ ঘোষণা।''[১]

আবার অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত তাঁর 'কল্লোল যুগ' গ্রন্থে শিবরামকে 'কল্লোলের' দলে টেনেছেন। ''কারণ ''কল্লোলের'' সমসময়ে শিবরাম বিপ্লবপ্রধান কবিতা লিখত। যার কবিতার বইয়ের নাম ''মানুষ'' আর ''চুম্বন'' সে তো সবিশেষ আধুনিক।''[২] কিন্তু বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় কবিতা প্রকাশিত হলেও কোনো গোষ্ঠী বা ব্যক্তির মোহান্ধ ভক্ত ছিলেন না শিবরাম।

১৩২৯ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যায় (৪৬ বর্ষ) 'ভারতী' পত্রিকার ১০৯০ পৃষ্ঠায় শিবরাম চক্রবর্তীর প্রথম মুদ্রিত কবিতা 'কোকিল ডাকে'[৩] প্রকাশিত হয়। শিবরামের প্রথম মুদ্রিত কবিতাটির মধ্যে পূর্বের অমুদ্রিত কবিতায় হাত পাকানোর ইতিবৃত্ত বর্তমান। শৈশবে কবি বাবা, বিদুষী মার স্নেহ ছায়া ও প্রেরণায় বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকের বাইরে নানারকম সাময়িক পত্র-পত্রিকার সঙ্গে বড়দের কাব্য-উপন্যাসাদি পড়ার সুযোগে পরিপুষ্ট কল্পনাপিয়াসী শিবরামের আশৈশব কবিতার প্রতি সবিশেষ আগ্রহ বর্তমান। মায়ের কাছে কথিত মহাকবি কৃত্তিবাসের পদাঙ্ক ধরে ''শিবরাম পণ্ডিত কবিত্বে বিচক্ষণ / লঙ্কা কাণ্ডে গাহিলেন গীত রামায়ণ''[৪] কিংবা ''শিবরাম পণ্ডিত এক বিচক্ষণ কবি / সাতকাণ্ডে গাহিলেন গীত রামায়ণ সবি''[৪]। তাছাড়া বাবার পদাবলী সংগ্রহ পড়ে খাতায় বৈষ্ণব পদাবলী রচনার প্রয়াস—এ সবই শিবরামের অল্প বয়সের কবিকল্পনার স্বচ্ছন্দ বিচরণের প্রথম ধাপ।

অনেকটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'-এর মতো কৃত্তিবাসের পদাঙ্কানুসারী শিবরাম একদিন ভোরে একটি কোকিলের ডাকে প্রেমাবেশে সাড়া না দিয়ে পারলেন না। লিখলেন 'অভাবিত লেখা' 'কোকিল ডাকে' কবিতাটি। প্রায় আট স্তবকের কবিতাটিতে যৌবন মুকুলিত বসন্তের স্মৃতি বিজড়িত হাতছানি, পাঠক বিস্মিত হবে তরুণ কবির সুপ্ত অনুভূতি উপলব্ধি করে —

কোকিল ডাকে ভোরের ফাঁকে আম্র শাখে
ভোরের বাতাস যায় যে চিরে .....
ব্যথার তীরে হঠাৎ ধীরে। .....
মনে পড়ে ছেলেবেলার বন্ধু খেলার
মিলন মেলার সঙ্গিনীকে —
প্রতিদিনের রঙ্গিনীকে।
কথায় গভীর ব্যথায় নিবিড়
সেই মোহিনীর সঙ্গটাকে
কোকিল ডাকে![৫]

উচ্ছ্বসিত তরুণ কবি নিজেই কবিতাটির জন্য বিস্মিত। তাই বৃদ্ধ বয়সেও শিবরাম অকপটে বলেছেন —

"অভাবিত এই লেখাটা কোত্থেকে এল এমন হঠাৎ? এই ছন্দ মিল শব্দের ঝর্ণা প্রপাত — যার মধ্যে কাশীরামী কৃত্তিবাসী পয়ারকীর্তির বিন্দুমাত্র ছায়াপাত নেই? এ কৃতিত্ব কার? অবাক হয়ে আমি ভাবি। নিজের বলে দাবী করতে পারি না কিছুতেই।"[৬]

সেদিনই কবিতাটি 'প্রবাসী' ও 'ভারতী'তে ছাপার জন্য পাঠালেও প্রথমটিতে প্রকাশিত হয়নি। 'প্রবাসীর' সহকারী সম্পাদক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭ - ১৯৩৮) শিবরামের দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়। তিনি তরুণ কবিকে পড়াশোনায় সবিশেষ মনোযোগ দেওয়ার জন্য পরামর্শ দিয়ে কবিতাটি প্রকাশ করার ক্ষেত্রে অনিচ্ছা জানিয়ে চিঠি পাঠান। তাতে যে 'তরুণ' কবির উৎসাহে ভাটা পড়েনি তা তাঁর আত্মজীবনী "ঈশ্বর পৃথিবী ভালবাসা"য় লক্ষ করা যায়। চাঁচল রাজবাড়ির অনতিদূরে হট্ট মন্দিরের দেওয়ালে ডিমাই সাইজের প্রকাণ্ড একখানা কাগজ নিয়ে একাই দেওয়াল পত্রিকা সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। তাঁর কথায়—

"নাই বেরুলো কোনো পত্রিকায়, প্রকাশ পাওয়া নিয়ে কথা। একেলা গায়কের নহে তো গান, গাহিতে হবে দুইজনে। তেমনি কেবল লেখকের নয় তো লেখা ; পাঠকের অপেক্ষা রয়েছে সেখানে।

হাতে লিখে লিখে বিলিয়ে দেবো না হয় জনে-জনে তার কী হয়েছে? পড়ুয়া নিয়ে হল কথা, পড়ানো নিয়ে ব্যাপার।"[৭]

কবিতা প্রকাশের প্রসববেদনা শুধুমাত্র দেওয়াল পত্রিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল না, বিদ্যালয়ের

'কয়েকটা একসারসাইজ খাতা ভর্তি হয়ে গিয়েছিল' তাঁর অমুদ্রিত কবিতায়। তার মধ্যে উল্লেখ্য ক্লাসে বসে লেখা কবিতার ক'লাইন —

এসো প্রাণ সখা বোসো পাশে
কহো দুটি কথা মধু ভাষে।
চাহো আঁখি তুলে মুখপানে
বলো যা তোমার মনে আসে।.....
আছে তো মোদের বনিবনা
থাকো না কেনগো মম আসে।[৮]

'ভারতী'তে তাঁর 'কোকিল ডাকে' ছাপা হয়। কিন্তু এর পূর্বেও শিবরামের কবিতায় হাত পাকানোর নিদর্শন রয়েছে। ১৩২৯ বঙ্গাব্দে মালদা জেলার চাঁচল থেকে শ্রী তারাপদ মৈত্র সম্পাদিত 'মুরলী' নামে একটি হাতে লেখা মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সেই পত্রিকায় প্রায় নিয়মিত কবিতা লিখতেন শিবরাম। চাঁচলের রাজবাড়ীর অনতিদূরে কলিগ্রামের ভারতী ভবন পাঠাগারে 'মুরলী' পত্রিকার একটি সংকলন সংরক্ষিত রয়েছে। ১৩২৯ বঙ্গব্দের ১ বর্ষের ৩ সংখ্যায় (আশ্বিন মাস) ২৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত 'কামনা' কবিতাটিতে কবি নিজের মনস্কামনা পূরণের জন্য ইষ্টদেবতার কাছে অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন। কবিতাটির মধ্যে শিবরামের নিঃসঙ্গ জীবনের প্রতিচ্ছবি প্রতীয়মান —

সৌন্দর্যেরই স্বপ্ন পুরী মাঝে
জীবনবীণায় গান খানি গো বাজে
নিশিদিনই বাজে !
যেন টানে তোমারই হাতছানি !
জীবন আমার ফুটুক দলে দলে
রূপে রসে ভরে
যেন শেষে তোমার চরণ তলে
পূজা সাঙ্গ করে !
এই কামনা সব কামনা বড়
গন্ধ তাহার থাকুক চিরতর!
সবাই খুসী করে !
ফোটার শেষে যাবে যখন ঝরে!

সংরক্ষিত 'মুরলী' পত্রিকার সংকলনে আরও দুটি কবিতা রয়েছে। একটি কবিতার শিরোনাম

'পাখীর খাঁচা' অন্যটি 'রুদ্রমূর্তি ও মডারেটের স্ফূর্তি'। 'পাখীর খাঁচা' ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ১ বর্ষের অগ্রহায়ণ মাসে প্রকাশিত হয়েছিল। কবিতাটির রচনার উদ্দেশ্য কবিতার নামের নীচেই বন্ধনীমধ্যে নির্দেশিত হয়েছে পত্রিকাটির ১৩ পৃষ্ঠায় —

''ভারতীয় হিন্দু সমাজের ছয়কোটী তথাকথিত অস্পৃশ্য পতিত ভাইদের মুক্তি কামনায় রচিত''।

শ্রেণিবৈষম্যমূলক সমাজের পাশাপাশি হিন্দু সমাজের মধ্যে বর্ণভেদের কুফল কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে তা শুধু অতীত কেন, একবিংশ শতাব্দীর অতি আধুনিক সমাজেও দেখা যায়। এ বিষয়ে শিবরাম চক্রবর্তী ঐ তরুণ বয়সেও কতটা সচেতন ছিলেন তা তাঁর কবিতাতেই পরিলক্ষিত হয়। তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের আহ্বানে সাড়া দিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ করলেও যতটা না ইংরাজ শাসনের প্রতি বিষোদগার করেছেন, তার চেয়ে অনেক বেশি গুণে করেছেন তৎকালীন ঘুণে ধরা সমাজের সামাজিক অবিচারের প্রতি, তাঁর কাব্য - প্রবন্ধাদির মাধ্যমে। সেদিক থেকে 'পাখীর খাঁচা' কবিতাটি পূর্বাভাস মাত্র। চারটি স্তবকে সমাপ্ত এই কবিতাটিতে শিবরামের ভাষায় বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুলের কাব্যভাষার সাদৃশ্য বর্তমান। যদিও নজরুলের সঙ্গে কবিতাটির কোন সংযোগ ছিল না।

কবি জীবনের শুরুতেই যৌবনের পরশমণির স্পর্শে স্পন্দিত হলেও কবি সমাজের অমানবিক অবিচারে পর্যুদস্ত তথা অসহায়, ঘৃণিত, শোষিত, অবহেলিত, মেহনতি মানুষের ডাকে সাড়া না দিয়ে পারেননি। তাদের মুক্তজীবনের পরিপূর্ণ আস্বাদ পাওয়ার জন্য শৃঙ্খলাবদ্ধ অচলায়তনের প্রাচীর ভাঙার আহ্বান জানিয়েছেন কবি — এই কবিতায়। ভাষা-ভঙ্গির মধ্যে তীব্র বিদ্রোহাত্মক চেতনা ফুটে ওঠে —

শোনরে কুশল, আনরে মুষল
ভাঙ্গরে পাখীর খাঁচা।
যুগান্তরের শিকল ভেঙ্গে
ত্রিশ কোটীরে বাঁচা
উন্নত শির আজ যে সবে
ওদের মাথাই নীচু রবে ?
কোথায় কেরে আছিস মানুষ।
কার রে হৃদয় কাঁচা ?
ভাঙ্গরে পাখীর খাঁচা।

জাতি-বর্ণ ভেদের অভিশাপ নিরসনের সদিচ্ছামূলক কবিতা হিসাবে কবিতাটির তেমন গুরুত্ব

নেই। কারণ এর আগেই কবি সত্যেন্দ্র নাথ দত্ত তাঁর ''হোম শিখা'' (১৩১৪) কাব্যগ্রন্থের 'সাম্য-সাম' শীর্ষক দীর্ঘ কবিতায় এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন তাঁর স্বভাব সুলভ বাগ্‌বিন্যাসে —

''ধর্ম আছেন রন্ধন শালে জাতিটা নিরুপায়''।

কিন্তু গুরুত্ব রয়েছে কবির অন্তস্থিত ভাবতরঙ্গের স্পষ্টতায় ও ভবিষ্যতের সাম্যবাদী গণচেতনা ধর্মী রচনার সূচনায়। কবির নিজের কথায় —

''আমাদের কালের সমাজ-ব্যবস্থায় যেসব অবিচার অনাচার অত্যাচার মনে প্রচণ্ড নাড়া দিত, তার বিরুদ্ধেই আমি কলম ধরেছিলাম। ইংরাজের শাসন আমায় তেমন পীড়িত করেনি, যাকে বলে Social injustice সেই সব—যেমন অব্রাহ্মণদের ওপরে বামুনদের অত্যাচার, প্রজাদের ওপরে জমিদারের শোষণপেষণ—এই সবেই আমি বেশি অভিভূত হয়েছিলাম। সমাজবাদের ধুমধাড়াক্কা তখনো তেমনটা পড়েনি, সোভিয়েট মুল্লুকে সমাজতন্ত্র পত্তনের নামগন্ধ বাতাসে ভাসছিল, ঘুণাক্ষরের বার্তায় আসছিল—শুধু তারই সুদূর হাতছানি কাউকে কাউকে যেন কেমন উন্মনা করছে সে সময়। যার আবহে মনে হয়, প্রেমেন লিখেছিল, আমি কবি যত কামারের / কুমোরের / যত ছুতোরের আর ইতরের / ইত্যাদি (মিস-কোটেশন হয়ে গেল হয়ত বা ! যে মেমারি !) প্রত্যাসন্ন যুগের সেই সম্ভাবনার আবছায়াতেই আমার সে সময়ের লেখা যত না। পরে সেই সব ভাব-ভাবনাই ফলাও করে প্রবন্ধাকারে আমি ফলিয়েছি ..... কাজীকেও এই পথে আসতে হয়েছিল শেষপর্যন্ত—তার 'সাম্যের গান' কবিতায় যার পরাকাষ্ঠা দেখা যায়। ..... এমনকি তার ফাউন্টেন পেনের কালিও ছিল লাল। 'রক্ত ঝরাতে পারিনা তো একা / তাই লিখে যাই এ রক্ত লেখা / তার কোন কবিতার কোথায় যেন আছে না ?''[৯]

শিবরামের কথায় উল্লেখিত প্রেমেন্দ্র মিত্রের (১৯০৪ - ১৯৮৮) ''প্রথমা'' (১৯৩২) কাব্যগ্রন্থের 'কবি' এবং কাজী নজরুলের ''সর্বহারা'' (১৯২৬) কাব্য গ্রন্থের 'আমার কৈফিয়ৎ' দুটি কবিতাই 'পাখির খাঁচা' কবিতাটির পরবর্তী কালে প্রকাশিত হয়। এদিক থেকে কবি শিবরামের স্বতন্ত্রতাকে যেমন অস্বীকার করা যায় না, তেমনি তা যে তাঁর মেকি উল্লাস বা অন্তঃসারশূন্য ভাববৈচিত্র্যের খেয়ালীপনা নয় সে বিষয়ে জিজ্ঞাসার অবকাশ নেই।

'রুদ্রমূর্তি ও মডারেটের স্ফূর্তি' কবিতাটি পৌষমাসে (১ বর্ষ, ১৩২৯ বঙ্গাব্দ) প্রকাশিত হয়েছিল। এটি যে একটি প্যারডি তা ৪১ পৃষ্ঠায় কবিতার নামের সঙ্গে বন্ধনীর মধ্যে লিখিত রয়েছে। সূচিপত্রের সঙ্গে উপস্থাপিত প্যারডির নামকরণের বানানে পার্থক্য বর্তমান। সূচিপত্রের স্ফূর্তি ভেতরে ফূর্তি হয়েছে। কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ''খেয়া'' (১৩১৩) কাব্যগ্রন্থের 'দুঃখমূর্তি' শীর্ষক কবিতার প্যারডি। প্যারডির প্রতি

শিবরামের সবিশেষ দুর্বলতা বর্তমান। এই দুর্বলতা যতটা কবিতাটির ভাববস্তুর প্রতি ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করায় নয়, তার চেয়েও বেশি নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে কোনো বিষয়কে সেই কবিতার ছাঁচে উপস্থাপনা করা। ফলে তাঁর প্যারডিতে ব্যঙ্গের হুলে বিদ্ধ হতে হয় না কবিকে, সিদ্ধ হয় নবোদ্ভূত বিষয়ের ভিন্ন প্রয়োগ। প্যারডিটির প্রারম্ভেই তা উপলব্ধি করা সম্ভব বলে মনে হয় —

রুদ্রবেশে এসেছ বলে
তোমায় নাহি ডরিব হে
যে পায়ে মার সবুট - সে - পা
নিবিড় করে ধরিব হে,

শেষাংশ টুকুও আকর্ষণীয় —

তুমি যে আছ বক্ষে করে
মৃত্যু তাহা জানাক মোরে
চাব না কিছু কব না কথা
চাহিয়া রব বদনে হে !
মরণে আজি মরিছে লোক
মরুক লোক মরণে হে।

প্যারডি যে শুধুমাত্র ব্যঙ্গ-অনুকৃতি নয়, তা যে অনেক সময় প্যারডি রচয়িতার সমাজবোধের ভিন্নতর মাত্রা সংযোজন করে, তা শিবরামের প্যারডি বা প্যারডিধর্মী কবিতাগুলির মধ্যে একটু সচেতন হয়ে লক্ষ করলেই বোঝা যায়। যেমন ১৯২২ সালের ২১ জুলাই সাপ্তাহিক 'বিজলী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'আবার তোরা বামুন হ' কবিতাটি। কবিতাটি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ''মেবার পতন'' নাটকের শেষ দৃশ্যের 'কিসের শোক করিস ভাই, আবার তোরা মানুষ হ' গানের প্যারডি। মানুষ হলেই যে মানুষের কাছে মানুষের অধিকার বা মর্যাদা লাভ করা যাবে না, তা যে বর্ণভেদে জর্জরিত সমাজের কাছে কতটা নিষ্ঠুর বাস্তব তা বলাই বাহুল্য। সেই জন্য হিন্দু সমাজে শুধু মানুষ হলেই হবে না, বর্ণশ্রেষ্ঠ বা 'বামুন'হতে হবে। শিবরাম নিজে ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেও হিন্দু সমাজের বর্ণভেদে সৃষ্ট ব্রাহ্মণের ভণ্ডামির মুখোশটি খুলে দিতে দ্বিধাবোধ করেননি। পূর্বেই 'পাখীর খাঁচা'তে আমরা তা লক্ষ করেছি। এই প্যারডিটিতে ব্রাহ্মণ বা বামুনের স্বরূপ তৎকালীন সমাজ জীবনের প্রতিচ্ছবিতে অমলিন হয়ে ধরা দেয় —

—'কিসের শোক করিস ভাই
আবার তোরা বামুন হ'। .....

রাখিয়া টিকি, কাটিয়া ফোঁটা
হাজার দুয়েক পত্নী জোটা,
কুলীনতার কর্‌রে ঘটা
আবার তোরা বামুন হ'।। .....
ভুলিয়া যা রে সবাই নর
সবার প্রাণে আঘাত কর,
ধর্ম শুধু ব্যবসা তোদের
আবার তোরা বামুন হ'।।

প্যারডিটির বিপরীত সুর ধ্বনিত হয়েছে তাঁর ''মস্কো বনাম পণ্ডিচেরি'' প্রবন্ধ গ্রন্থের 'শূদ্র না ব্রাহ্মণ?' প্রবন্ধে। অবশ্য প্যারডির প্রত্যাশিত ব্যঙ্গই প্রবন্ধে স্পষ্টতা পেয়েছে।

১৯২৩ সালে স্বসম্পাদিত 'যুগান্তর' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্যারডি রচনার জন্য শিবরামের প্রায় দেড়মাসের কারাবাস হয়েছিল। তাঁর নিজের জবানীতে —

''পত্রিকায় প্রকাশিত যে কবিতাটার বিরুদ্ধে অভিযোগ, সেটা মূলত রবীন্দ্রনাথের বহুবিখ্যাত এক কবিতার প্যারডি। তাঁর উর্বশী কবিতাটার ব্যঙ্গানুকৃতিতে ভূর্বশী। আট-দশ স্ট্যানজা রচনার মাত্র গোড়ার দু'লাইনই মনে আছে আমার —

'নহ পিতা, নহ ভ্রাতা, নহ বন্ধু, নহ প্রতিবাসী
হে ভূপতি চৌরঙ্গী বিলাসী !'

তার পরের বাকীটা কেবল আমার মন থেকেই নয়, ত্রিভুবন থেকেই হারিয়ে গেছে।''[১০]

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ''চিত্রা'' (১৮৯৬) কাব্যের 'উর্বশী' কবিতাটির আরও তিনজন কবির প্যারডিও স্মরণীয়। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৯ - ১৯৭০) 'শালী' নামক প্যারডিতে 'শ্যালিকা বন্দনা'র রূপটি চমৎকার —

'' নহ প্রৌঢ়া, নহ বৃদ্ধা, নহ শিশু, নহ নাবালিকা
হে তরুণী রূপসী শ্যালিকা।''

আবার কবি বনফুলের (১৮৯৯ - ১৯৭৯) 'শালা' প্যারডিটিও স্মরণীয় —

''সামান্য মনুষ্য নহ, নহ শুধু গৃহিনীর ভ্রাতা, হে শ্যালক, হে স্বভাব - শালা।''

কিংবা, কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের (১৮৮২ - ১৯২২) 'সর্ব্বশী' প্যারডিটিও কম আকর্ষণীয় নয়—

''নহ ভেড়ী, নহ উষ্ট্রী, নহ গো মহীষী
হে দামুন্যা বাঘিনী সর্ব্বশী।''

তিনটির ছাঁচ প্রায় এক, বিষয় ভিন্নতার জন্য প্রত্যেকটিই স্বতন্ত্র। কিন্তু শিবরামের প্যারডিটির বিষয় ভাবনায় রবীন্দ্রনাথের 'উর্বশী'র আদলে অন্যগুলির ব্যঙ্গানুকৃতির প্রতিভাস নেই বললেই চলে। শিবরামের এই প্যারডিতে যতটা না রঙ্গরস, তার অনেক বেশি ব্যঙ্গরস পরিবেশিত হয়েছে। জমিদার শ্রেণির উপর বর্ষিত ব্যঙ্গ-রসের মাসুল গুণতে হয়েছে শিবরামকে। শুধুমাত্র একটি প্যারডি রচনার জন্য ব্রিটিশ সরকারের রোষানলে পড়া এবং শেষপর্যন্ত শাস্তি স্বরূপ কারাবাস লাভ—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য অধ্যায় সংযোজিত করেছে। কবির কথায় —

''কিন্তু কবিতাটা আদৌ ইংরাজরাজের বিরুদ্ধে নয়। ছিল সেকালের জমিদার আর অত্যাচারের বিরুদ্ধেই। ..... কাজেই, কবিতাটা প্রায় তরোয়ালের ন্যায় ধারালো হলেও ইংরেজের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো যায় না।''[১০]

তবুও কেন তাঁকে ভুক্তভোগী হতে হয়েছিল সে প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন —

'' উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপানো নেহাত সহজ কাণ্ড নয় তো। তৎকালীন রাষ্ট্রবিপ্লবের তপ্ত আবহাওয়ায় সমাজবিপ্লবের ধারণাও কেউ করতে পারেনি। কানপুরের বোলশেভিক কনস্পিরেসির কেস তখনও হয়েছে কিনা মনে পড়ে না ঠিক, রাশিয়ার কালান্তরকারী কার্যকলাপের সমূহ খবর তখনো এদেশে এসে পৌঁছয়নি বোধ হয়, মজফ্‌ফর আহমদ প্রমুখ অগ্রপথিক কয়েকজনের মগজেই খেলা করছিল আইডিয়াটা, কাগজ - কলমে রূপধরে প্রকাশ পায়নি তখনো, সেইকালে শ্রেণীবিদ্বেষের এই প্রথম পদক্ষেপ আমরাই যে নিজেদের আগোচরে হঠকারিতায় করে বসেছি, নিজেরাই তা টের পাইনি।''[১১]

তিনি যে বিনয় প্রকাশ করে হঠকারিতার কথা বলেছেন তা সহজেই অনুমেয়। এর পূর্বেই কবিতা ও প্যারডিতে হিন্দু সমাজে বর্ণভেদের স্বরূপ প্রকাশের মানসিকতার মধ্যেই যে সূক্ষ্ম ভাবে সেই আইডিয়াটা কাজ করেছিল, তার সবিশেষ উল্লেখের প্রয়োজন নেই বললেই চলে। পরবর্তীকালে শ্রেণিচেতনার এই আইডিয়াটা ডালপালা বিস্তার করে তাঁর সৃজনবিশ্বে।

রবীন্দ্র সাহিত্যের প্রতি শিবরামের প্রথমাবধি তীব্র আকর্ষণ ছিল। তাঁর বৈচিত্র্যময় কবিজীবনে রবীন্দ্রনাথের উজ্জ্বল উপস্থিতি রইলেও তাঁকে কখনো সম্পূর্ণ মোহাচ্ছন্ন করতে পারেনি। ফলে যখনই রবীন্দ্র কবিসত্তার সঙ্গে তাঁর কবিমনের ব্যত্যয় ঘটেছে, কিম্বা অসঙ্গতি লক্ষ করেছেন, তখনই প্যারডিতে হোক বা প্যারডিধর্মী কবিতাতেই হোক, এমনকি কোনো সাধারণ কবিতায় তাঁর নিজস্ব চিন্তা-চেতনা উপস্থাপন করেছেন। পূর্বেই শিবরামের প্যারডিতে তা লক্ষ করা গিয়েছে। কবিগুরুর ''মানসী'' (১৮৯০) কাব্যের 'ভুলভাঙা'র 'জবাবে' 'বিদায় অভিশাপ' (১৩০০ বঙ্গাব্দে মাঘ মাসে 'সাধনা'য় প্রকাশিত) শীর্ষক 'কাব্যরস প্রধান নাট্যকবিতা'টির একটা 'উতোরে' শিবরাম 'ভারতী' পত্রিকায় প্যারডিধর্মী কবিতা 'ভুলভাঙা' লিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ''সোনার তরী'' (১৮৯৪) কাব্যের 'দুই পাখী' কবিতার প্রথম চার চরণের একটি প্যারডিধর্মী কবিতা লিখেছিলেন শিবরাম 'একটি স্তবক' শিরোনামে, বড়ই উপাদেয় সেটি—

''বাঘাযতীন ছিল বাংলা দেশের রাজা
শিব্রাম ছিল কোন ভ্রমে।
একদা কী করিয়া মিলন হল দোঁহে
নাতি ও নাতিনী মাধ্যমে।''[১২]

শিবরামের কবিতার বইয়ের প্রথমে উল্লেখ পাওয়া যায় তাঁর রচিত উপন্যাসের মধ্যে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে। ১৩৩২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত ''ছেলে বয়সে'' (১৯২৫) উপন্যাসের প্রদেয় বিজ্ঞাপন অংশে 'এই লেখকের রচনা এই বইগুলি শীঘ্রই প্রকাশিত হবে' বলে উল্লেখিত তিনটি বিজ্ঞাপিত বইয়ের মধ্যে প্রথমটি একটি কবিতার বই। বিজ্ঞাপনে 'ভালোবাসা চুমুর মতো ক্ষণিক অশ্রুর মতো চিরন্তন, সেই ভালোবাসার কবিতা' ও 'বাংলা সাহিত্যে অভিনব সুর' বিশেষিত কবিতার বইটির নাম ''চুমু ও অশ্রু''। কিন্তু ঐ নামে শিবরামের একটি কবিতা (১৩৩০ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসে তথা ৪৭তম বর্ষে ভারতী পত্রিকায় ৬৬৫-৬৬৬ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত) থাকলেও কবিতার বই প্রকাশিত হয়নি। মনে হয়, ঐ নামের পরিবর্তে শিবরাম কবিতার বইটির নাম দিয়েছেন ''চুম্বন''। ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে ভাদ্র মাসে বইটি আরেকটি কবিতার বই ''মানুষ''-এর সমসময়ে প্রকাশিত হয়েছিল। বই দুটি তিনি নিজের খরচে প্রকাশ করেছিলেন। কবির নিজের কথায় —

''টাকা নিয়ে লেখা আর রয়্যালটি পেয়ে প্রকাশককে বই দেবার কাঞ্চন কৌলিন্য লাভে পেশাদার লিখিয়ের পর্যায়ে দাঁড়াবার আগে নিজের খরচায় বই ছাপাতে হয়েছিল আমাকে। সেকালে প্রকাশিত লেখার সংগ্রহে গদ্য পদ্যর তিনখানা বই বার করতে হয়েছিল আমায়। কবিতার বই দুটোর নাম 'মানুষ' ও 'চুম্বন', আর গদ্যটির, প্রবন্ধ বই—আজ এবং আগামীকাল।''[১৩]

বিনাদক্ষিণায় ১৯২৪ সাল থেকে ১৯২৯ সালের মধ্যে লেখা 'আত্মশক্তি','উত্তরা', 'ভারতবর্ষ',

'কালিকলম', 'ধূপছায়া', 'নবশক্তি' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতাগুলিকে স্বতন্ত্র করে 'মায়ের কাছ থেকে টাকা নিয়ে এসে' ভালো কাগজে কুন্তলীন আর্ট প্রেস থেকে 'স্বর্গত হিতেন বসুর' সহযোগিতায় প্রকাশ করেন। সুমুদ্রিত বই দুটিতে এম.সি.সরকার এণ্ড সন্স (১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা) এর নাম প্রকাশক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। বই দুটির বিক্রি ভালোই হয়েছিল। ''যদিও প্রথম সংস্করণই ছিল শেষ সংস্করণ''।[১৪]

কবিতার দুটি বইই বর্তমানে দুষ্পাপ্য। 'বই দুটির একেবারেই কোনো উদ্দেশ নেই' বলে জানিয়েছেন তাঁর ''ভালবাসা পৃথিবী ঈশ্বর'' গ্রন্থে।

একই সময়ে প্রকাশিত হলেও ''চুম্বনে''র কবিতা ''মানুষে''র পূর্বেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে শুরু করেছিল। ''চুম্বনে''র 'চুম্বন' কবিতাটি (গ্রন্থের দ্বিতীয় কবিতা) ১৩৩১ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যা মাসিক 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। প্রায় শ-দুই ছত্রের দীর্ঘ দুপাতা ব্যাপী এই 'চুম্বন' কবিতাটি হল 'চুম্বনের শতনাম-চুমুর হরিহর ছত্রই'। দুঃসাহসী ও অভিনব চুম্বন প্রেমের সারোৎসার উপস্থাপনে আকর্ষণ বর্তমান। চুম্বনপ্রেমিক কবির অভিব্যক্তির মুক্তি ঘটলেও পত্রিকা সম্পাদককে সমালোচনার ব্যঙ্গ বিদ্রুপের বাণে জর্জরিত হতে হয়েছিল 'শনিবারের চিঠি'র 'সংবাদ সাহিত্যে'। 'ভারতবর্ষে'র স্বনামখ্যাত সম্পাদক জলধর সেনকে 'শনিবারের চিঠি'র সজনীকান্ত দাসের ব্যঙ্গ-হুলে বিদ্ধ হতে হয়েছিল— 'ফাগুনের ভারতবর্ষে আমাদের জলধরদা বুড়ো বয়সে আগুন ছুটিয়েছেন'। পরবর্তীকালের সমালোচকের ভাষায় —

''অথচ কবিতাটি ছন্দ মাধুর্যে আঙ্গিকে উপমায় কাব্যময়তায় এক অপূর্ব সৃষ্টি।''[১৫]

রোমান্টিক ভাবকল্পনায় আসক্ত হয়েও কবি বাস্তবের যোগসূত্রকে উপেক্ষা করেননি। একদিকে সুকুমার সেন উল্লেখিত 'চুম্বনে কামরতির জয়োচ্ছ্বাস' থাকলেও অন্যদিকে উল্লিখিত রয়েছে কবি কৃষ্ণ ধর কথিত রোমান্টিক ভাবচেতনায় উদ্বুদ্ধতার সঙ্গে বাস্তব চেতনার সহাবস্থান। তাই 'চুম্বন' কবিতায় আবেগ উচ্ছ্বাসের বৈতরণী মাঝ নদীতে ডুবে না গিয়ে কিনারায় এসে ঠেকেছে। 'চুম্বনে'র চুম্বন আকর্ষণে কবি-কল্পনার প্রসার এখানে লক্ষণীয় —

সোনার কাঠির জাগরণ যেন রূপালী কাঠির নিদ-মোহ-
চুম্বন যেন মানবের চির বিদ্রোহ!
চুম্বন টানে বাঁধা আছে তাই খসিছে চন্দ্র-সূর্য না !
চুম্বন যেন অনাদি কবির গভীর ছন্দ-মূর্চ্ছনা !
চুম্বন যেন নটীর নৃত্য—গোপন মনের হর্ষ–
চুম্বন যে মুকুল - ফোটানো মলয়-বনের স্পর্শ!

আরও প্রগাঢ় কল্পনার ব্যাপ্তি ফুটে উঠেছে —

চুম্বন যেন কিছুটা বিষের, কিছুটা সে গড়া অমৃতের, -
তাই কিছু তার গাওয়া যায় গানে, কিছু থাকে ধরা অগীতের ! .....
কিছুটা তাহার শূন্যে মিলালো, কিছু লুটে নিল ত্রিভুবন,
পলকের দান চির-অফুরান - চুম্বন !'

শিবরামের অফুরন্ত চুম্বনের চুম্বন-প্রেমের অনেক কথা স্পষ্ট ভাষায় বলার চেষ্টা এই প্রথম নয়, চুমুর তুল্যমূল্যের কথা এর পূর্বেও প্রকাশিত হয়েছে। ১৩৩০ বঙ্গাব্দের ১১ মাঘ সাপ্তাহিক 'বিজলী' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি কবিতাতেও চুম্বনের প্রতি আসক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে —

আয়লো সাকী তোমার ঠোঁটে
প্রেম সিরাজী পান করি,
আমার তুমি তোমার আমি
এই কথাটি গান করি। .....
বাহুর মাঝে বুকের মাঝে
সকল - হারা সুখের মাঝে
চুমুর মাঝে ঘুমের মাঝে
মূর্ছামাঝে দাও ছুটি।

এখানেই শেষ নয়, নলিনীকান্ত সরকার তাঁর 'হুকার কবি শিবরাম' প্রবন্ধে জানিয়েছেন —

"বিজলীতে এই জাতীয় আদি রসাত্মক কবিতা বেরিয়েছিল অনেকগুলি।"[১৬]

তার মধ্যে শিবরামের স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়েছিল দুই চরণের একটি সরস চুটকি কবিতা। 'বোমার লোকদের কাছে চুমার তত্ত্ব' তথা 'যুগান্তকারী লোকদের কাছে' প্রেরিত 'যুগান্তকারী' কবিতা যা শিবরামের ভাষায় —

"ছোট্ট চুমকি চমক্ মেরেছিল একসময় ..... মনে পড়ে বেশঃ
এক চুমুকে গণ্ডূষ করার মতন লেখাই !
"জানি জানি / সবাই সবে / ছাড়বে।
চলারপথে / কে কার চুমু / কাড়বে ?"[১৭]

'বোমার লোক' বা 'যুগান্তকারী' লোক বলতে নলিনীকান্ত সরকার আন্দামান ফেরত মহাবিপ্লবী বারীন্দ্র কুমার ঘোষ ও উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নির্দেশ করেছেন। উভয়েই বিজলী পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। যুগান্তরকারী কবিতা বলার মধ্যে অতিরঞ্জন নেই বললেই চলে। নলিনীকান্তর কথাকে সমর্থন করে শিবরাম বলেছেন —

"নলিনীদা বিশেষ অত্যুক্তি করেননি। সেকালের বাংলা লেখায় চুমুর ছড়াছড়ি তেমন দেখা যেত না। কবিগুরুর সেই বিখ্যাত সনেটটি বাদে শরৎচন্দ্রের কিরণময়ীই দিবাকারের ভিজে ঠোঁটের উপর একটা চুমু খেয়েছিল যা।"[১৮]

প্রৌঢ়ত্বের দ্বার পেরিয়ে শিবরাম অতীতের স্মৃতিমেদুর কবিজীবনের দিকে তাকিয়ে নিজেই বিস্ময় প্রকাশ করেছেন, চুম্বন প্রেমাসক্ত কবিতা রচনার প্রসঙ্গে। কবির নিজের কথায় —

"কিন্তু ভাবি আজ, এই সব কবিতা সেই বয়সে আমার মাথায় এল কি করে? খাতার পাতায়ই বা এল কীসে ?

আমার লেখা বলে মনেই হয় না যেন।"[১৯]

এমনকি বহুদিন পরেও কবির লেখা দুটি ছত্রে ভেসে ওঠে বিস্ময় মাখানো জিজ্ঞাসা এবং তার উত্তর দানেরও প্রচেষ্টা —

লিখেছি কি আমি অনেক বন্ধু ?/
আমি তো সেসব লিখিনি।/
ছিলো যে লেখিকা জনেক বন্ধু!/
ছিলাম আমি তার লেখনী।।

সেই সঙ্গে কবির প্রশ্ন —

"কে ছিল সেই লেখিকা? ওহেন কৃতিত্ব কার? এই প্রেরণার জন্য কার কাছে ঋণী আমি? ..... রিনিই কি?

নাকি, সেই তিনিই?"[২০]

কবির কাছেই যে প্রশ্নের উত্তর স্পষ্ট নয় সেখানে অন্য কারও পক্ষে সদুত্তর প্রদান দুরাশামাত্র। তবে তাঁর আত্মজীবনীদ্বয়ে এবিষয়ে অগোছালো অথচ উপলব্ধি করার মত যথেষ্ট আলোকপাত করা হয়েছে।

শিবরাম তাঁর যৌবনের শুরুতে লেখা কবিতাগুলি সম্পর্কে দ্বিধাহীন ভাবে বলেছেন ''সেই কাঁচা বয়সের এসব লেখা এমন কিছু চমৎকার হয়েছিল আমি মনে করি না। তবে তার ভেতরকার আবেগটা ছিল হয়ত খুব। চমৎকার না হলেও গোড়াকার আমার লেখাগুলো যে চুমুৎকার হ'ত বেশ, তার কোনো ভুল নেই।''[২১]

কবির মন্তব্যটি ''চুম্বন'' সম্পর্কে যতটা খাটে ''মানুষ'' সম্পর্কে খাটে না বললেই চলে। ''মানুষে''র কয়েকটি কবিতায় 'চুম্বন' শব্দটির প্রয়োগ থাকলেও তা নিতান্তই চিত্রকল্প রচনার প্রয়োজনে ব্যবহৃত। একই সঙ্গে প্রকাশিত হলেও ''চুম্বন'' ও ''মানুষ'' যেন শিবরামের দুটি স্বতন্ত্র সৃষ্টি। প্রথমটির মধ্যে প্রেমিকাসত্তা, দ্বিতীয়টিতে বিদ্রোহীসত্তা। একটিতে উচ্ছ্বসিত আবেগ, অন্যটিতে অধিকার-সচেতক বিবেক। অন্যভাবে বলা যায় কবি শিবরাম প্রথমটিতে চুম্বনপ্রেমিক, দ্বিতীয়টিতে মানবপ্রেমিক। অবশ্য দুটিই যৌবনের সাধারণ ধর্ম। কিন্তু ''চুম্বনে''র চেয়ে ''মানুষে''র কবি যেন অনেক বেশি স্বচ্ছ ও প্রাণবন্ত। ''চুম্বনে''র রোমান্টিক চেতনার গভীর অরণ্যে পথ হারানোর কোনো সম্ভাবনা ''মানুষে'' নেই। ''মানুষে'' মানবতাপূজারী শিবরামকে সহজেই চেনা যায়। ভাব ও ভাষায় ''মানুষে''র বক্তব্য বাস্তব চেতনায় সমৃদ্ধ। কবির জীবনবোধ কত সূক্ষ্ম ও সম্পূর্ণ তা এই বইটির প্রায় প্রত্যেকটি কবিতায় ছড়ানো রয়েছে।

প্রায় তিনবছর ধরে লেখা কবিতাগুলির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় অসহায় মানুষের জীবন যন্ত্রণা। কিন্তু সমালোচক তথা কবি কৃষ্ণ ধরের কথায় —

''এই মানুষ কোনো ঔপনিষদিক মানবাত্মা নয়, রক্তমাংসের মানুষ যাদের কথা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন বিশের দশকের বিপ্লবী কবি নজরুল ইসলাম। শিবরাম শ্রমজীবি মানুষের পক্ষেই লিখেছিলেন তাঁর কবিতা মানুষের শ্রমে নির্মিত যে সভ্যতার ইমারত তাকে ধ্বংস করে দিতে উদ্যত একশ্রেণীর মানুষ যারা পৃথিবীকে তাদের কুক্ষিগত করে রাখতে চায়। এই অসহনীয় সামাজিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধেই কবির প্রতিবাদ।''[২২]

প্রায় একই কথা বলেছেন সমালোচক কমল কুমার দত্ত —

''যন্ত্রসভ্যতার অভিশাপ, মানুষের পাশব প্রবৃত্তি, মনুষ্যত্বের অপমান তাঁকে চিন্তিত ও সোচ্চার করে তুলেছে কখনো, কখনো বা 'এই দ্বন্দ্ব এ মোর যৌবন' নিয়ে বিব্রত — 'এরে আমি কেমনে যে সহি!' এই নিয়ে 'মানুষ'।''[২৩]

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকার সুকুমার সেন শিবরামের বই দুটির কবিতাগুলিকে সাময়িক ফ্যাশনের আদর্শ কবিতা বলে চিহ্নিত করেও ''মানুষের কয়েকটি কবিতায় শ্রমিকের ও দরিদ্র - বঞ্চিতের বেদনার প্রকাশ'' বলে অভিহিত করেছেন।

ক্ষমতা ও অধিকারে, শাসন ও শোষণে মানুষে মানুষে রচিত অদৃশ্য ভেদ রেখা পশুকেও হার মানায়। ''মানুষ'' - এ সেই ভেদ রেখাকে স্পষ্ট করে কবি দুর্দশা গ্রস্ত অসহায় জনজীবনের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করতে চেয়েছেন। প্রায় প্রতিটি কবিতায় কবির খেদ, অভিমান বর্ষিত হয়েছে। দীর্ঘ কবিতা গুলিতে গণচেতনা জাগানোর সচেষ্ট প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।

সাধারণ ভাবে বলা হয়েথাকে মানুষ 'অমৃতস্য পুত্রাঃ'। কথিত থাকলেও আসলে তা যে কতখানি অসার বাক্‌সর্বস্ব তা মানুষের অর্থহীন জীবনের পাশবিক যন্ত্রণা উপলব্ধি করলে বোঝা যায়। রাষ্ট্র - ধর্ম - শাস্ত্র - গুরু - মন্ত্র - তন্ত্রের ষড়যন্ত্রে, 'শোষণ শাসনে' রুদ্ধ মানুষের যন্ত্রণাক্লিষ্ট জীবনকাহিনির প্রতি আলোকপাত করেছেন কবি ''মানুষে''র প্রতিনিধিস্থানীয় 'মানুষের মূল্য' কবিতায়। মানুষের জঘন্য চরিত্র - প্রকৃতিতে কবি বিক্ষুব্ধ, তাই তাঁর লেখনীর আঁচড়ে এত জ্বালা —

''কখনও শুনেচ কারো মুখে —
বাঘেরে খেয়েছে বাঘ, ভালুক ভালুকে?
মানুষে মানুষ খায়, খেয়ে বেঁচে থাকে প্রতিদিন —
রক্ত খায়, মাংস খায়, মেদ মজ্জা খেয়ে করে ক্ষীণ
খায় মন আত্মা, খায় জীবনের অর্ধেক নিঃশ্বাস
অবশেষ জীবন্ত - কঙ্কাল ফেলে দেয়, করো কি বিশ্বাস?
যাও - যেথা যেথা কল-কারখানা, যাও গ্রামে গ্রামে,
স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করো মনুষ্যত্ব চড়েছে নিলামে।''

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ''চিত্রা'' (১৮৯৬) কাব্যের 'এবার ফিরাও মোরে' - এর ''এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে / দিতে হবে ভাষা ; এইসব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে / ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা;''-র প্রতিও শিবরামের দৃঢ় অনাস্থা —

''তুমি বলো, ইহাদের তরে আলো চাই, চাই মুক্তবায়ু,
অন্ন চাই, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু —
ইহাদের বুকে আশা, মূক মুখে ভাষা দেওয়া চাই।
আমি বলি, ইহাদের জীবনের কোনো মূল্য নাই!''

LIBRARY NBU DARJEELING
13 DEC 2005
179128

কারণও স্পষ্ট —

"মানুষের মানুষ শিকারী —
নারীরে করেছে বেশ্যা, পুরুষেরে করেছে ভিখারী।"

আসলে শিবরাম একান্তভাবেই মানুষের কবি। শুধুমাত্র মানুষকে নিয়েই দীর্ঘ কবিতার একটি বই বাংলাসাহিত্যে সত্যিই সুদুর্লভ। "মানুষে"র কবিতাগুলির প্রকাশভঙ্গিতে রবীন্দ্রনাথ, কাজী নজরুল ইসলাম এবং সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখের ছায়া থাকলেও তা একান্তই শিবরামের।

একদিকে "আজ এবং আগামীকাল"(১৯২৯)-এর প্রবন্ধে, অন্যদিকে "মানুষে"র (১৯২৯) কবিতায় এবং "চাকার নীচে" (১৩৩৫) ও "যখন তারা কথা বলবে" (১৯৩০)-এর মতো একাঙ্ক নাটকে শিবরামের গণচেতনাধর্মী সাহিত্য রচনার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটেছে। লক্ষণীয় বিষয় হল স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে রচিত কবিতাগুলিতে ব্রিটিশরাজ তথা ইংরেজ প্রশাসনের বিরুদ্ধে কোনোরূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়া নেই। সবগুলি কবিতাতেই শিবরাম বিধাতা বা নিজের কাছে মনোবেদনা প্রকাশ করেছেন।

কিন্তু শিবরাম আদিরসাত্মক বা চুম্বনসর্বস্ব কবিতা ও বিদ্রোহাত্মক কবিতা যেমন লিখেছেন, তেমনি লঘু হাস্যরসাত্মক কবিতাও রচনা করেছেন। সাহিত্য সমালোচক মানস মজুমদার তাঁর 'শিবরামের হাসির কবিতা' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছেন —

"কৌতুক রসাশ্রিত গল্পগুলির মতো তাঁর কৌতুক-রসাত্মক কবিতাগুলিও খুব সহজেই পাঠক চিত্ত জয় করেছে। কবিতাগুলি সুপাঠ্য; অনাবিল হাসির অফুরন্ত উৎস।"[২৪]

এধরনের অনেক কবিতা 'কবিতা', 'নিরুত্তর', 'একক', 'দেশ' প্রভৃতি বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। শিবরামের সরস বাচনভঙ্গি ও অভিনব বিষয়ের চমকপ্রদ উপস্থাপনা কবিতাগুলির সতেজতাকে বাড়িয়ে দেয়। 'যথাপূর্বম' 'পূর্বরাগ এবং পশ্চাত্তাপ', 'রুবি দে', 'বাড়িওয়ালার বাড়াবাড়ি', 'মতবদল', 'অমার্জনীয়', 'নামবিভ্রাট' ইত্যাদি কবিতা এই প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য। হরিপ্রাণের বিড়ম্বিত দাম্পত্য জীবনের ছবি বড়ই করুণ অথচ হাসির উদ্রেক করে —

আমাদের প্রতিবেশী শ্রীমান হরিপ্রাণ
পত্নীর বড় বেশী বাধ্য;
গিন্নীর ত্রাসে তিনি সদাই কম্পমান,
খাদকের মুখে যথা খাদ্য;

মারধোর খেয়ে হায় কখন প্রাণ হারান,
সাবধান রন্ যথাসাধ্য।
(যথাপূর্বম)

আবার বাড়িওয়ালার কথামত ঘন্টাদুয়েকের মধ্যে বাড়ির পূর্বের অবস্থা ফিরিয়ে আনতে 'ভাড়াটিয়া' বটুবাবু হগ্‌বাজারের আড়তদার ভারতচন্দ্রকে অর্ডার দিয়ে রীতিমত বিস্মিত করেছিলেন। পাঠককেও হতবাক হতে হবে অর্ডারের ফর্দ শুনে —

হাজার ত্রিশেক আর্সোলা চাই, নেংটি ইঁদুর তিনশো,
গোটা-বিশেক কাঁকড়া-বিছে—চটপট আমায় দিনতো!
(বাড়িওয়ালার বাড়া বাড়ি)

কিংবা 'রুবি দে' কবিতাটির বাগ্‌চাতুর্যে অভিভূত হতে হয় —

ছুরির ফলার মতো রয়েছে বিঁধে
আমার মর্মমূলে - সেই রুবি দে।
ভোলাও যায় না তারে,
রাখাও তো বেদনা রে।
কোনোরূপে কোনোধারে নেই সুবিধে।
ধারালো ছুরির মতো সেই রুবি দে।

ছোটোদের জন্যও লিখেছেন অনেক সরস কবিতা। তার মধ্যে 'পৃথিবী বানানো', 'জন্মদিনের', 'রিহার্সাল', 'জমা খরচ', 'কথাশিল্পী', 'খুকুর ভাবনা', 'কৌতুকী' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

শিবরাম চিরকুমার শুধু নয়, চিরশিশুও বটে। বৃদ্ধ বয়সেও শিশুর মতো দিলখোলা প্রাণোচ্ছল ও সজীব রসে উজ্জীবিত ছিলেন। তাঁর গল্প-উপন্যাসে দুষ্টু মিষ্টু শিশুর মতো কবিতাতেও কচিকাঁচার উজ্জ্বল উপস্থিতি। তাই তাঁর অনুভূতিতেও বিস্ময় মাখানো হাতছানির জিজ্ঞাসা —

এত যে সুষমা রূপ
পায় কোত্থেকে
ওই কচি মুখ ?
ফুরায় না দেখা মোর

দেখে আর দেখে —
জুড়ায় না বুক।
(কচি মুখ)

পরবর্তী কালে এই কচি মুখের প্রাণখোলা হাসির জগতে উন্মুক্ত করে দিয়ে নিজেকে খুঁজে ফিরেছেন তাঁর সাহিত্যে।

এছাড়া শিবরাম ভিন্নস্বাদের নানা ধরনের কবিতা লিখেছেন। জার্মানের কবি হেইনরিখ হাইনে (১৭৯৭ - ১৮৫৬) - এর একটি কবিতাও বাংলায় অনুবাদ করেছেন।

কবিতাগুলি গ্রন্থভুক্ত হলেও স্বতন্ত্রভাবে কবিতার বই আকারে বের হয়নি।

শিবরাম শখের বশবর্তী হয়ে কবিতা চর্চা করেননি বললেই চলে। তাঁর জীবনের পুঞ্জীভূত অভিজ্ঞতায় সুখ-দুঃখের স্মৃতি বিজড়িত তাঁর কবিতা। তাই তাঁর কবিতা কৃত্রিমভাবে বানানো নয়, জীবনরসে স্নিগ্ধ। রবীন্দ্রনাথ ''চুম্বন'' ও ''মানুষ'' প্রকাশের আগেই চিঠি[১৫] লিখে শিবরামের কবি জীবনের উজ্জ্বল সম্ভাবনার কথা ব্যক্ত করেছিলেন —

কল্যাণীয়েষু

তোমার কবিতা পড়ে আমি খুব আনন্দ পেয়েছি। মাঝে মাঝে তোমার লেখা আমার চোখে পড়েছে এবং অনুভব করেছি তোমার কবিত্বশক্তি আছে। বাংলা সাহিত্যে তুমি খ্যাতিলাভ করবে এ সম্বন্ধে আমার সন্দেহ নেই।

ইতি
শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৪শে পৌষ ১৩৩২

রবীন্দ্রনাথের ভবিষ্যৎ বাণী ফলেছিল কিন্তু কবিতার বই দুটির খ্যাতিলাভের পরে সাহিত্যের অন্য ধারায় যতই সক্রিয়ভাবে নিজেকে নিয়োজিত করেছেন , ততই ক্রমশ শিবরামের নামের আগে কবি শব্দটি অস্পষ্ট হতে শুরু করে। পাঠক মানসে শিবরাম জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন 'শিব্রাম' নামে। এই নাম তাঁর স্বকৃত আবিষ্কারও।

ফলে শিবরাম চক্রবর্তীর লেখকসত্তার বিবর্তনে তাঁর অন্যতম পরিচয় একজন সার্থককবি হিসাবেই সেকথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

খ) প্রাবন্ধিক শিবরাম

প্রাবন্ধিক শিবরাম সব্যসাচী শিবরাম চক্রবর্তীর পরিচয়ের আর এক দিগন্ত। বলতে গেলে তর্ক-বিতর্কমূলক প্রবন্ধগুলিই প্রথম লেখক শিবরাম চক্রবর্তীর পরিচয়ের পরিসীমা অতিদ্রুততার সঙ্গে বৃদ্ধি করেছিল। ইতিপূর্বে নবপর্যায় 'যুগান্তর' (১৯২৩), 'আত্মশক্তি'(১৯২৪) পত্রিকার সম্পাদনাসূত্রে, বিভিন্ন পত্রিকায় কবিতা রচনার মধ্যদিয়ে, সচিত্র 'শিশির' ও 'ভারতী' পত্রিকায় গল্প প্রকাশ এবং ''জমিদারের রথ'' ও ''ছেলে বয়সে''র (১৯২৫) মতো উপন্যাস লিখে যতটুকু পরিচিতির ভিত তৈরী হয়েছিল, বিতর্কিত প্রবন্ধগুলি তাতে আরও শক্তি বৃদ্ধি করেছিল। তাঁর নিজস্ব টাকায় প্রকাশিত দুটি কবিতার বই ''মানুষ'' (১৯২৯) ও ''চুম্বন'' (১৯২৯) - এর দ্বিতীয় সংস্করণ বের না হলেও প্রবন্ধের বইটি ''আজ এবং আগামীকাল'' (১৯২৯) একাধিক সংস্করণ হয়েছে। আসলে অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো প্রবন্ধিক শিবরামের মধ্যেও লেখক শিবরামের শক্তিমত্তার পরিচয় নিহিত রয়েছে।

শিবরাম 'নবশক্তি' (১৯২৯) পত্রিকায় প্রাবন্ধিক হিসাবে আত্মপ্রকাশের পূর্বে হাত পাকিয়েছেন নবপর্যায় 'যুগান্তর' ও 'আত্মশক্তি 'পত্রিকা সম্পাদনা কালে। ১৯১৭ সালে রাশিয়ার বলশেভিকদের সফল বিপ্লবের প্রভাব এই দেশেও ক্রমান্বয়ে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। 'প্রবাসী,' 'মালঞ্চ', 'মোহম্মদী', 'তত্ত্ববোধিনী', 'ভারতী' প্রভৃতি সাময়িক পত্র - পত্রিকায় রাশিয়ার এই যুগান্তকারী বিপ্লবকে স্বাগত জানিয়েছিল।[৭] এই বিপ্লবের ফলে মানুষের অধিকার চেতনা তথা গণচেতনা জাগরণের প্রক্রিয়া 'আত্মশক্তি', 'যুগান্তর', 'ধূমকেতু', 'সংহতি', 'গণবাণী', 'লাঙল', 'নবশক্তি' প্রভৃতি সাময়িক পত্র-পত্রিকায় স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এগিয়ে চলতে থাকে। শিবরাম চক্রবর্তী এই প্রেক্ষাপটে প্রথমে 'যুগান্তর' (নবপর্যায়) এবং পরে 'আত্মশক্তি' সম্পাদনা করেন। হিন্দু সমাজের বর্ণভেদ প্রথা এবং জমিদারতন্ত্রের শোষণ ও শাসনের বিরুদ্ধে তাঁর লেখনী প্রথমাবধি সচল ছিল। কিন্তু এই গণচেতনা জাগরণের প্রেক্ষাপটে তাঁর সাম্যচেতনার ভিত আরও শক্ত হয়েছিল। শিবরাম 'যুগান্তরে'র প্রেরণা প্রসঙ্গে জানিয়েছেন —

'' সমাজবাদের ধুমধাড়াক্কা তখনো তেমনটা পড়েনি, সোভিয়েট মুল্লুকে সমাজতন্ত্র পত্তনের নামগন্ধ বাতাসে ভাসছিল, ঘুণাক্ষরের বার্তায় আসছিল—শুধু তারই সুদূর হাতছানি কাউকে কাউকে যেন কেমন উন্মনা করেছে সে সময়। যার আবহে মনে হয়, প্রেমেন লিখেছিল, আমি কবি যত কামারের/কুমোরের / যত ছুতোরের আর ইতরের / ইত্যাদি (মিসকোটেশন হয়ে গেল হয়ত বা! যে মেমারি!) প্রত্যাসন্ন যুগের সেই সম্ভাবনার আবছায়াতেই আমার সে সময়ের লেখা যত না। পরে সেই যত ভাব-ভাবনাই ফলাও করে প্রবন্ধাকারে আমি ফলিয়েছি তারানাথ রায় সম্পাদিত নবশক্তির পাতায়—যা পরে আমার মস্কো বনাম পন্ডিচেরি আর ফানুস ফাটাই—এই দুই নিবন্ধ বইয়ে প্রকাশ পেয়েছে। কাজীকেও এই পথে আসতে হয়েছিল শেষ পর্যন্ত—তার

'সাম্যের গান' কবিতায় যার পরাকাষ্ঠা দেখা যায়।"[২]

শিবরামও লিখেছিলেন সাম্যবাদী দীর্ঘ কবিতা[৩] —

যারা পথ কাটে,গাড়ি টানে, তাড়ি খায়, গায় সারিগান,
তাহাদের সবার সমান —

বিপ্লবী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অন্তরীণ হলে তাঁর প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত পত্রিকা 'আত্মশক্তি' (১৯২২) - র সম্পাদনার দায়িত্ব পেয়েছিলেন শিবরাম। এই পত্রিকায় অনেক লেখাই 'স্বনামে, বেনামে, ছদ্মনামে বিবিধ ফীচারে লিখে ভরাট' করে দিতেন তিনি।[৪] সম্পাদক শিবরামের 'বামন পণ্ডিত ও হিন্দুসমাজ' এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়।[৫]

মানুষের মধ্যে সাম্যবাদী চিন্তাচেতনার প্রচার ও প্রসারে রক্ষণশীল প্রগতিবিরোধী চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবী সাহিত্যিকেরাও প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছিলেন। সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরী 'আত্মশক্তি'তে সেই সময়ের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে লিখেছিলেন —

" মতের কারও কোনও স্থিরতা নেই কিন্তু মেজাজ সবারই এক অর্থাৎ বেজায় চটা। প্রত্যেকের রাগ এই যে আর কেউ কিছু করছে না। দেশের জন্য দশের জন্য দেশের লোক কেউ কিছু ভাবে না, কেউ কিছু করে না, আর যে ভাবে সে ভুল ভাবে, আর যে কিছু করে সে অন্যায় করে অতএব ঝাড়ো সবার উপর ঝাল। সংক্ষেপে বাংলায় আজ সবাই বিরক্ত, সবাই অসন্তুষ্ট। কার উপর বিরক্ত, কিসের উপর অসন্তুষ্ট? সকলের উপর বিরক্ত সব জিনিষের উপর অসন্তুষ্ট। আমাদের সকলের মনের কথা এই যে একটা কিছু হওয়া চাই। আর যা হওয়া চাই তা হচ্ছে না, অথচ কি যে হওয়া চাই তা আমরা কেউ জানিনে, কেউ বলতে পারিনে।"[৬]

ক্রমশ প্রমথ চৌধুরীর উত্থাপিতপ্রশ্নের উত্তর স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। 'আত্মশক্তি'র পৃষ্ঠায় একদিন লেখা হল সাময়িক সাহিত্য কলমে—"বেঁচে থাকাটা মানুষের চরম লক্ষ্য না হলেও আমাদের যথেষ্ট ভাবতে হয় কি করে বেঁচে থাকতে হবে। আমরা যে লক্ষ্যের কথাই বলি তার গোড়ার কথা হল বেঁচে থাকা। তাই বেঁচে থাকার সঙ্গে ভাত ও রুটির সমস্যা সংশ্লিষ্ট। আজকালকার আর্থিক জগতে এই ভাত রুটির সমস্যাকে অনেকে চরম সমস্যা মনে করেন — তাই আমরা পাই Communism - Bolshevism প্রভৃতি। এই ism - এর মূল হল ভাতরুটি সমস্যা। সাহিত্যেও এদের স্থান দিতে হবে।"[৭]

ইতিমধ্যে 'আত্মশক্তি'র ৩৮ সংখ্যায় (তৃতীয় বর্ষ) পণ্ডিচেরীর ঋষি অরবিন্দর ভাবশিষ্য বিশিষ্ট চিন্তাবিদ শ্রী নলিনী গুপ্ত বলশেভিকদের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেন। তারই প্রতিবাদে শিবরাম লেখনী

ধারণ করেন। লেখেন তাঁর অসাধারণ প্রবন্ধ 'মস্কো বনাম পণ্ডিচেরি'। যৌক্তিক পারম্পর্যে ও উপস্থাপন নৈপুণ্যে তাঁর এই প্রবন্ধের আবেদন অভিনব হয়ে ওঠে। শিবরাম লিখেছেন —

"গোড়াতেই বলে রাখি, বোলশেভিকের পক্ষ-সমর্থনের জন্য আমি কলম ধরিনি। কেননা বলশেভিজম অনেক বড়ো বড়ো আক্রমণ সয়েও টিকে আছে, আশাকরি নলিনীবাবুর ধাক্কাও সে সামলে উঠবে। আমি চিন্তিত হয়ে পড়েছি গীতা-উপনিষদ ইত্যাদি আমাদের ঘরোয়া সাবেক রক্ষা করতে। কারণ নলিনীবাবু যেভাবে গীতা উপনিষদের মতো অতি পুরোনো মাপকাঠি দিয়ে বলশেভিকির অতি আধুনিক ও অত্যন্ত বিরাট বিশ্বরূপ মাপতে লেগেচেন, তাতে আমার আশঙ্কা হয়, মরচে পড়া কাঠিগুলি না মচকে যায়। মনে হয়েচে তাঁর মানদণ্ডের প্রাণদণ্ড দিতেই যেন তিনি মরীয়া।"[৮]

তিনি পরিষ্কার করে জানিয়ে দিয়েছেন —

"আমি বলতে চাই, শ্রীকৃষ্ণের গীতার চেয়ে কার্লমার্কসের গীতা বড়ো, কেননা এই গীতা আজকের মানুষের জীবনে সত্য হয়ে উঠেচে - পুরানো গীতার কোনো বচন দিয়েই এই নূতন গীতার সৃষ্টিশক্তির পরিমাপ করা যায় না। সব্যসাচীর জ্ঞাতি-বিরোধের কুরুক্ষেত্রের চেয়ে লেনিনের শ্রেণী সংগ্রামের বিশ্বক্ষেত্র ঢের বড়ো -আদর্শের দিক দিয়ে। জগতের দুঃখে বুদ্ধদেব কেঁদে আকুল হয়ে কঠোর বাস্তবের হাত থেকে পালিয়ে আত্মরক্ষা করেছিলেন, কিন্তু লেনিনকে আমি বুদ্ধের চেয়েও বড়ো বলবো এই জন্যে যে, তিনি তাঁর কঠোরতর সাধনায়, সবলতর বাহুর জোরে এই কঠিন বাস্তবকে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে,গুঁড়ির থেকে নূতন করে গড়তে পেরেচেন।"[৮]

এভাবে তিনি সুরেশ চন্দ্র চক্রবর্তী, মহেন্দ্রনাথ রায়, এবং শচীন সেনের ক্ষুরধার লেখনীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর কথায় —

"নলিনী গুপ্তের প্রবন্ধ চিন্তায় গভীর, সুরেশ চক্রবর্তীর লেখা বুদ্ধিতে শানানো। আমি তখন বয়সে তরুণ। তখনো লেখক হইনি, লেখার মতন লিখিনি কিছুই। ইস্কুলের সেই গোরুর রচনার পরে প্রবন্ধ বলতে কিছু লিখেছি কিনা সন্দেহ। সে গোরচনার পুঁজি নিয়েই গবেষণার বিরুদ্ধে দাঁড়ালাম।"[৯]

কিন্তু তিনি যে সফল হয়েছিলেন তা তাঁর প্রকাশকের কথাতেও প্রতীয়মান হয়। "মস্কো বনাম পণ্ডিচেরি"র (১৯৪৩) প্রথম প্রকাশক শ্রী মহাদেব সরকার জানিয়েছেন —

" বাংলা সাহিত্যে তৎকালে প্রগতিবাদী কর্ম্মী ও ভাবুকসমাজ 'আজ এবং আগামী কাল'- এর রচনার নিজেদের ভাষা খুঁজে পেয়েছিল, সুধী পাঠকবর্গ সেই বহুসমাদৃত রচনাবলীর পুনর্মুদ্রণে আন্তরিক

আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন, বর্তমান 'মস্কো বনাম পণ্ডিচেরি' নামান্তরে সেই 'আজ এবং আগামীকাল' গ্রন্থেরই পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ।''[১০] ''মস্কো বনাম পণ্ডিচেরি'' একাধিক সংস্করণ হয়েছে , তা বলাই বাহুল্য।

প্রথমদিকে শিবরামের অধিকাংশ প্রবন্ধই ছিল তর্ক-বিতর্কমূলক। ''আজ এবং আগামীকালে''র (১৯২৯) প্রবন্ধ 'মস্কো বনাম পণ্ডিচেরি' নামেই পরবর্তী সংস্করণ প্রকাশিত হয়। 'সাধারণ মানুষ ও সুপারম্যান',' সুপারম্যানিয়া',' কবি জয়ন্তী', 'সঙ্ঘ মানেই সাঙ্ঘাতিক' এবং' বিজ্ঞানের সার্থকতা'-এই পাঁচটি প্রবন্ধ ''মস্কো বনাম পণ্ডিচেরি'' (১৯৪৩)তে যুক্ত হয়। কিন্তু পরবর্তী সময়ে শুধুমাত্র ১১টি সামাজিক প্রবন্ধ নিয়ে ''মস্কো বনাম পণ্ডিচেরি'' নতুন সংস্করণ (১৩৫৯) প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণে শিবরাম ভূমিকাও লিখেছিলেন। তৃতীয় সংস্করণে আরও ৪ টি রচনা সংযোজিত হয়। রচনাগুলি হল—'সহজ হওয়া লেখক', 'কিশোরদের জন্য সাহিত্য', 'হাসির গল্প হাসিল করা' এবং 'শিল্পীর স্বাধীনতা'। ফলে ''আজ এবং আগামীকালে''র মতো ''মস্কো বনাম পণ্ডিচেরি''তেও মূলত সামাজিক ও সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধের সমন্বয় রয়েছে। কথা সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্মরণ করে লেখা অত্যন্ত উপাদেয় একটি সরস রচনাও আছে। শিবরামের আরেকটি প্রবন্ধ সংকলন ''ফানুস ফাটাই'' (১৯৬০) । এতে ১৪টি রচনা রয়েছে। তার মধ্যে সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধের সঙ্গে 'ঘরে বসে ঘোরা', 'স্বাক্ষর শিকার', 'চিত্রকলা'-এর মতো যেমন রম্যরচনা রয়েছে তেমনই 'শেষ আলাপ' এবং 'লেখক হওয়া সহজ' - এর মতো ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণামূলক রচনাও সংকলিত হয়েছে। এই প্রবন্ধগ্রন্থে সামাজিক কোনো প্রবন্ধ নেই।

এছাড়াও শিবরামের বেশ কিছু অগ্রন্থিত প্রবন্ধ রয়েছে। 'নবশক্তি' পত্রিকায় ' অচল টাকা' (১৫ মে ১৯৩১) 'বাঙলা' পত্রিকায় পত্রপ্রবন্ধ 'অচল টাকার বাদ্যি (১৯ জুন ১৯৩১) , 'নাচঘর'-এ 'উপসংহার' (৯ ও ১৬ শ্রাবণ ১৩৩৮) প্রভৃতি উল্লেখ্য। অগ্রন্থিত প্রবন্ধগুলি সবই কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ''দেনাপাওনা'' (১৯২৩) উপন্যাসের নাট্যরূপ ''ষোড়শী''[১১]কে কেন্দ্র করে রচিত। নাট্যরূপটি শিবরামেরই দেওয়া। এমনকি নামকরণও তাঁর। অথচ 'ভারতী' পত্রিকায় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নামেই প্রকাশিত হয়। প্রাপ্য স্বীকৃতিও অর্থ কোনোটাই না পাওয়ার জন্যই শিবরাম প্রকারান্তরে তর্ক- বিতর্ক সূত্রে প্রবন্ধগুলি লিখেছিলেন। প্রবন্ধগুলিতে ক্ষেত্রবিশেষে ব্যক্তিগত আক্রোশ প্রকাশিত হয়েছে। ইচ্ছেকরেই তিনি তাঁর প্রবন্ধ সংকলনে প্রবন্ধগুলি গ্রন্থিত করেননি। এছাড়াও সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'লিটল থিয়েটার' নামক খোলাচিঠির প্রতিবাদে 'গ্রেট থিয়েটার' (১৯৩০) প্রবন্ধটি রচনা করেন।[১২] এই প্রবন্ধটি তাঁর আধুনিক নাট্যবোধের পরিচয় দেয়। পরবর্তীকালেও কতিপয় প্রবন্ধ লিখেছিলেন। যেমন 'কবিতার উপসর্গ' সবিশেষ উল্লেখ্য।[১৩]

শিবরামের প্রবন্ধগুলিকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে। যথা সামাজিক এবং সাহিত্যিক তথা সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধ।[১৪]

সামাজিক প্রবন্ধ ঃ সামাজিক প্রবন্ধেই শিবরাম প্রথম খ্যাতি লাভ করেন , সেকথা পূর্বেই প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা হয়েছে। রাশিয়ার সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকে স্বাগত জানিয়ে বিতর্কের সামনে যেভাবে রুখে দাঁড়িয়ে সামাজিক প্রবন্ধগুলি লিখেছিলেন একের পর এক, তার মধ্যে প্রাবন্ধিক ভূপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য নির্ভীক শিবরামের সন্ধান পেয়েছেন। তাঁর কথায় —

''সেযুগে রাশিয়া ছিল একরকম একঘরে, সবার কাছে অবিশ্বাস ভয় ও বিদ্রূপের পাত্র। ভারতের তৎকালীন কোন কোন পত্র-পত্রিকায় তো তাকে নিয়ে নিয়মিত ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশিত হতো। রাশিয়ার সেই একলা চলার যুগে লেনিনের সমর্থনে তিনি যে তাঁর ক্ষুরধার লেখনী ধরেছিলেন—এ বড়ো কম কথা নয়। কতো বড়ো বুকের পাটা ও সত্যনিষ্ঠা থাকলে এ কাজ সম্ভব তা অনুমান করা কঠিন নয়।''[১৫]

প্রাবন্ধিক অশোক মিত্র শিবরাম চক্রবর্তীকে 'বহুরূপী' আখ্যা দিয়ে তাঁর ঐ সময়ের ''মস্কো বনাম পণ্ডিচেরি''র প্রবন্ধগুলি রচনার জন্য বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছেন —

''শিবরাম চক্রবর্তী বিশের দশকে 'সোটুম-দেবের হৃদয়ে আমাদের জন্য চিরদিন No Room লিখে পার পেয়ে গিয়েছিলেন। এখন যদি লিখতে যেতেন, পাড়ার লোকে হয়তো পুলিশ ডাকতো, কিংবা নিজেরাই এগিয়ে এসে এই হতচ্ছাড়া বেজন্মা লেখকটাকে প্রহারেণ ধনঞ্জয় বানিয়ে ছাড়তো। শিবরাম চক্রবর্তী মরে বেঁচেছেন।''[১৬]

তারুণ্যের সহজাত স্পর্ধায় সেই সময় রাশিয়ার বলশেভিকদের স্বাগত জানিয়ে যেভাবে নিজেকে উপস্থাপিত করেছিলেন, পরবর্তী সময়ে শিবরাম নিজেও বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। অবশ্য তিনি বলেছেন —

''এ দেশে প্রথম যাঁরা কমিউনিজমের ধ্বজা ধরেছিলেন, তাদের মধ্যে আমি একজন হয়ত বা প্রথমতম। (সেই ধ্বজা আমার 'মস্কো বনাম পণ্ডিচেরি' নামক বইয়ের মধ্যে বিধৃত)। তখনও এখানে কমিউনিষ্ট পার্টির গোড়াপত্তন হয়নি। নামগন্ধও ছিল না দেশে। কিম্বা নামগন্ধই শুধু ছিল হয়ত। মার্কসীয় সাহিত্যের আমদানি হয়নি তখনো, কমিউনিজম নামটাই এসেছিল কেবল।

সেই নামমাত্র সম্বল নিয়ে ঐ-তন্ত্রে ওয়াকিবহাল না হয়েও যে আমি কলম ধরতে পেরেছিলাম, তার কারণ সাম্যবাদ আসলে এদেশের চারা, বিদেশের কলম নয়। বিদেশী কমিউনিজমের বাস্তব চেহারা যাই হোক না, সর্বমানবের সাম্যবাদের তার যে ভাব-রূপ তা একান্তভাবেই ভারতের। বুদ্ধবাণীতে উদ্বুদ্ধ, ভারতীয় বিভিন্ন ধর্মের সাধনায় ধারাবাহিক, গান্ধীবাদে এসে তা-ই উদার। সাম্যবাদের ভাবাদর্শ আমাদের কাছে বিদেশী নয়।''[১৭]

প্রাবন্ধিক রমাকান্ত চক্রবর্তী "মস্কো বনাম পণ্ডিচেরি"র নতুন সংস্করণের (১৩৫৯) ১১ টি সামাজিক প্রবন্ধ সম্পর্কে বলেছেন —

" ধর্মীয় পাণ্ডাদের পুষ্পধূপ সুরভিত পবিত্র কথা উড়িয়ে দিয়ে শিবরাম যে এগারটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তাতে আমার গণনায় সর্বসাকুল্যে একশ তেরাশিটি সূত্র বা point আছে। প্রত্যেকটি সূত্রই নিদিধ্যাসনের বিষয়। এক কথায় বলা যায় শিবরামের 'মস্কো বনাম পণ্ডিচেরী'র সূত্রসমূহের আলোচনা একটা মাঝারি আকৃতির সন্দর্ভ হয়ে উঠতে পারে।"[১৮]

তথ্যভার রহিত যুক্তিনিষ্ঠ সামাজিক প্রবন্ধগুলি কত সমৃদ্ধ তা সমালোচকের মন্তব্যেই ফুটে ওঠে। আসলে পূর্বেই শিবরামের সামাজিক অবিচার অনাচার জমিদারের শোষণ ও শাসনের বিরুদ্ধে যে সাম্যবাদী চিন্তা-চেতনার ভিত প্রস্তুত হয়েছিল তারই আরও সার্থক জোরালো তথা সুস্পষ্ট গণচেতনা জাগরণের প্রচেষ্টা সামাজিক প্রবন্ধগুলির মধ্যে নিহিত রয়েছে। সমালোচক অশোক মিত্র যথার্থই বলেছেন —

"গত ষাট দশকে মস্কোর পরিষঙ্গ বদলে গেছে, পণ্ডিচেরী'রও। কিন্তু, শিবরাম চক্রবর্তী এই প্রবন্ধগুলি লিখেছিলেন যখন, তখনও এই স্থান নামদ্বয় ব্যবহৃত হয়েছিল নেহাৎই প্রতীকী অর্থে, যুক্তি বনাম ভক্তির বিন্যাস-প্রতিবিন্যাস ব্যাখ্যার অভিপ্রায়ে।"[১৯]

শিবরাম নিজেও বলেছেন —

"আমার সেই পরমাশ্চর্য বই মস্কো বনাম পণ্ডিচেরির প্রবন্ধগুলিতে কেবল যে ধনতন্ত্র সাম্রাজ্যবাদ আর উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধেই জেহাদ ছিল তাই নয়, আমাদের ব্রাহ্মণ পুরোহিততন্ত্রের বিরুদ্ধে, জাতিভেদ ও জমিদারি প্রথার বিরুদ্ধে মঠ, মোহন্ত আর সঙ্ঘজীবনের বিরুদ্ধে সাংঘাতিক সবকথা ছিল।"[২০]

শিবরামের গণচেতনাধর্মী সামাজিক প্রবন্ধাদির মূলপ্রতিপাদ্য বিষয়ই হচ্ছে সাম্যবাদ। তাঁর কথায়—

"সাম্যের মূল ভারতীয় ঐতিহ্যের অন্তর্গত, তার অন্তর-গতি আমাদের মনের ফল্গুধারায়। সমস্ত মানুষের সমত্ব আর মানুষের প্রতি মমত্ব-- এই বোধের দৃষ্টি এখানে এতই সহজ যে, এর জন্য মার্কসীয় দর্শনের অপেক্ষা রাখে না। উপনিষদে উপ্ত, আর বুদ্ধদেবে অঙ্কুরিত হয়ে গান্ধীজীতে এসে তা শাখা প্রশাখা প্রসারিত হয়েছে। গান্ধীবাদই, আমার মনে হয়, কমিউনিজমকে সম্পূর্ণ করতে পারে। একদিন তা করবেও। ভারতীয় আত্মিক সাম্যের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের আর্থিক সাম্যনীতির আত্মীয়তা ঘটলেই বিশ্বজনীন সাম্যবাদের সাফল্য ঘটতে পারে। আর ঘটবেও তাই। আমার এই লেখাগুলির মূলকথাও ছিলো ঐ।"[২১]

তিনি যেমন রাশিয়ার বলশেভিকদের সপক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন তেমনই তৎকালে পণ্ডিচেরির আধ্যাত্মিক

চিন্তাধারার বিরুদ্ধেও কলম শানিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য সুভাষচন্দ্র বসুও সেই সময়ে পক্ষান্তরে রাশিয়ার বিপ্লবকে সমর্থন করেছিলেন এবং পণ্ডিচেরির চিন্তাধারার বিরূপ সমালোচনা করেছিলেন। এছাড়াও 'নবশক্তি' পত্রিকায় উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যাযের 'বিপ্লবতত্ত্ব' - এর তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। অর্থাৎ তৎকালে তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে রাশিয়ার বিপ্লবকে অবলম্বন করে একদিকে যেমন গণচেতনা জাগরনের প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিল, তেমনি তার বিরুদ্ধ সমালোচনাও সাম্যবাদ প্রচারের অন্তরায় সৃষ্টি করেছিল। ঋষি অরবিন্দের আরেক ভাবশিষ্য দিলীপকুমার রায়ের 'বিজ্ঞানের ট্রাজেডি' ই শিবরামের লেখনীতে 'বিজ্ঞানের সার্থকতা'র রূপ পায়। বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণাকে শিবরাম 'অতিবড় ট্রাজেডি 'বলে অভিহিত করেছেন। দিলীপকুমারের মানব মুক্তির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাকে নস্যাৎ করে দিয়ে তাঁর সরস অভিব্যক্তি উল্লেখ্য —

" বিজ্ঞানের কবল থেকে ভগবানেও যে নিষ্কৃতি পাবেন, একথা আমি মনে করিনে। শ্রীকৃষ্ণ থেকে শ্রীঅরবিন্দ পর্যন্ত সব মহাপুরুষই মানুষের সহিত ভগবানের যোগসাধনের প্রয়াস পেয়েচেন। দিলীপ কুমারের মতে, ভারত চিরদিনই ভগবানকে প্রিয়তম হতে প্রিয়ই মনে করে এসেচে, চিরদিনই অর্জুনের ভাষায় বলতে চেয়েছে—

"পিতেব পুত্রস্য সুখেব সখ্যুঃ
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢুম্!" কিন্তু হলে কি হবে, সোঢুম- দেবের হৃদয়ে আমাদের জন্য চিরদিনই no Room ! কান্নাকাটি করেও ভগবানের দিক থেকে কোনোদিনই কোনো response পাওয়া যায়নি।"[২২]

শিবরাম সেই কালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অসাধারণ মানুষ' তথা 'সুপারম্যান' বিশেষণকে অস্বীকার করে সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর 'কাবুলিওয়ালা' প্রবন্ধের প্রতিবাদে লিখেছিলেন 'সাধারণ মানুষ ও সুপারম্যান'। অবশ্য পরে দুঃখ প্রকাশ করেও সত্য প্রকাশে দ্বিধা করেননি। শিবরামের সাম্যচেতনার গভীরতা তাঁর অভিমতের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে —

" সবাই সুপারম্যান হবে একথা সুরেশবাবু বলেন না, কেন না তাহলে সুপারম্যান কথাটির অনর্থ দাঁড়ায়! কিন্তু সকলেই সম্পূর্ণ হতে পারে, একথা আমি বলি। একজনের ধনী হতে হলে অনেককে দরিদ্র হতে হয় এবং নিজের বিভব বজায় রাখতে দরিদ্রের দরিদ্র করে রাখাই ধনীর একমাত্র কাজ হয়ে দাঁড়ায়। তেমনি সুপারম্যানকে অনেক খর্ব মানুষের অপেক্ষা রাখতে হয়, তা নইলে তাঁর প্রতিষ্ঠা ঘটেনা।"[২৩]

এছাড়াও —

"প্রশ্ন এই, গুরুজাতীয় অতি-মানুষেরা সাধারণ মানুষের কী প্রয়োজনে আসেন, কোন্ দায় থেকে

বাঁচান? যে মানুষ পায়, সে নিজের কাছেই পায়, গুরুর কৃপায় নয়। যে নিজের কাছ থেকে পাবার কৌশল জানেনি সমস্ত পৃথিবী তার প্রতি কৃপণ।"[২৩]

সেজন্য তার অনুসিদ্ধান্ত পাঠককে ভাবিয়ে তোলে —

" আসলে সুপারম্যানেরা হচ্ছে আজকের অসম্পূর্ণ অসুস্থ মানবতার রুগ্ন লক্ষণ; তার রোগের বিচিত্র উপসর্গ; - মানুষ-যে সুস্থ হতে চাচ্চে, এই উৎকট উদ্ভট চিহ্নগুলি তারই পরিচয়। মানুষ যখন সম্পূর্ণ হবে তখন তার মধ্যে কোনো প্রকারেরই আতিশয্য থাকবে না; কেননা অভ্রভেদী কোনকিছু হয়ে ওঠা নয়। তখন তার মধ্যে শোভা পাবে একটা সহজ সঙ্গতি, স্বচ্ছন্দ সুষমা; শতদলের মতো সর্বতোমুখ পরিপূর্ণতা।"[২৩]

এছাড়াও সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে তর্ক-বিতর্কসূত্রে শিবরাম আরও তিনটি প্রবন্ধ রচনা করেছেন। এগুলি হল 'সুপারম্যানিয়া', 'কবি জয়ন্তী' এবং 'সঙ্ঘ মানেই সাঙ্ঘাতিক'। শিবরাম প্রথম থেকে প্রতিষ্ঠান বিরোধী মানসিকতার অধিকারী ছিলেন। তাই কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রাতিষ্ঠানিক শক্তি সাধারণ মানুষের মঙ্গল সাধন করতে পারে না বলে তাঁর বিশ্বাস। তাঁর ভাষায় —

"মানুষ হচ্ছে এমন বস্তু যা নিজে চললেই চলে, চালাতে গেলে সে অচল। রামকৃষ্ণ - সঙ্ঘ এবং অনুরূপ কতকগুলি প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা ব্যাপার আছে, তবে সে সব Lesser Brain - এর কেরামতি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ও শ্রী অরবিন্দ যখন সঙ্ঘ গড়েন তখন মনে হয় এ সাঙ্ঘাতিক। এ দুর্বিপাক—তাঁদের পক্ষেও যেমন, তাদের আওতার মধ্যে যারা—তাদের পক্ষেও তেমন। কেননা মানুষ নিজের ভেতর থেকে হয়ে ওঠে, তাকে করে তোলা যায় না। করে তুলতে গেলেই সে আর যাইহোক মানুষ হয় না।"[২৪]

শুধু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই নন, তাঁর জনপ্রিয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বিশ্বভারতী সম্পর্কেও শিবরামের তীব্র সমালোচনা লক্ষ করা যায়—"বিশ্বভারতী মৌলিকশিক্ষাতত্ত্বের উদ্ভাবনাগার নয়। কোনো নতুন শিক্ষা- প্রণালীর পীঠস্থানও না, সঙ্ঘ-হিসেবেও এর যা সার্থকতা তা ব্যক্তিগত স্বার্থের কথা। বিশ্বভারতী রবীন্দ্রনাথের বিরাট এক অপকর্ম।"[২৫]

অবশ্য পরবর্তী সংস্করণে শিবরাম অপকর্মের পরিবর্তে অপত্যকর্ম হিসাবে অভিহিত করলেও প্রবন্ধটি থেকে বিষয়টি বাদ দেননি। তাঁর কথায় —

" লাইনটি এবার আমি তুলে দিতে পারতাম কিন্তু ইচ্ছে করেই দিইনি। সেযুগের এক লেখকের উদ্ধত রূপের উদাহরণ স্বরূপ রেখে দিয়েছি। কিন্তু একথা আমি এখানে বলতে চাই যে, বিশ্বভারতীকে

রবীন্দ্রনাথের অপকর্ম বলে এখন আমি মনে করিনে। মনেকরি, এটা তাঁর অপত্যকর্ম্ম।''[২৬]

শিবরাম তাঁর প্রত্যাশিত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সঙ্ঘের সাঙ্ঘাতিক ক্রিয়া কর্মকে প্রতিহত করার জন্য আবেদন জানিয়ে বলেছেন —

''কোনোদিন যদি এখানে সোসিয়ালিস্ট স্টেটের প্রতিষ্ঠা হয়, তার প্রথম কাজই হবে দেশব্যাপী ছোট-বড়ো -মাঝারী যত সঙ্ঘ আছে সব ভেঙে দেওয়া; মানুষের মন থেকে False God এবং ভূয়ো Philosophy দূর করা, দুয়ো করা, উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করা যে, এ সমস্তই—'' সব-জুট্ হায়।''[২৭]

শিবরাম লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ার সফল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে যেমন স্বাগত জানিয়েছেন, তেমনই মহাত্মাগান্ধীর নেতৃত্বে অহিংসা আন্দোলন বিশেষ করে হরিজন আন্দোলনকে মহৎদৃষ্টির পরিচয় বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর পূর্বে বিশেষ করে স্বামী বিবেকানন্দ এবং পরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ''রাশিয়ার চিঠি''তে (১৯৩০) শূদ্র জাগরণের কথা ব্যক্ত করেছিলেন। এপ্রসঙ্গে প্রয়োজনীয় আলোচনা ''বাংলা সাহিত্যে গণচেতনাধর্মী সাহিত্যধারায় শিবরাম চক্রবর্তী'' অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। হিন্দু ধর্মের বর্ণভেদ প্রথা ও বর্ণবৈষম্যমূলক রীতিনীতির ফলে হিন্দু জাতির অবক্ষয় একথা শিবরাম যুক্তিসঙ্গত দৃষ্টান্ত সহযোগে উপস্থাপন করেছেন। হিন্দু সমাজে ব্রাত্য অব্রাহ্মণ বিশেষ করে শূদ্রশক্তির জাগরণ অবশ্যম্ভাবী বলে তিনি মনে করেন। কারণ তাঁর কথায় —

''যে ব্রাহ্মণরা হিন্দু সভ্যতার মাথা ছিল, তারা এখন টিকি-তে গিয়ে কেন টিকলো - কেবল টিকিতেই নয়, টীকাতেও বটে—তার কারণ বোঝা অতঃপর কঠিন হবে না। ব্রাহ্মণ-সভ্যতাও গেছে, ক্ষত্রিয়-সভ্যতাও গেছে, শক্তি ও মনীষার আভিজাত্য এখন অব্রাহ্মণের পদতলে। আমাদের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক মনীষী ব্রজেন্দ্র শীল, শ্রেষ্ঠ কর্মশক্তি মোহনদাস গান্ধী—দু'জনের কেউই উচ্চবর্ণ নন। বিবেকানন্দ, চিত্তরঞ্জন, অরবিন্দ—কেউই বামুন নন এঁরা।''[২৮]

সেজন্য অবশ্য শিবরাম শূদ্রের প্রাণশক্তির পুঁজির উপরেই নির্ভর করা ঠিক নয় বলে মনে করেন। তাঁর অনুসিদ্ধান্ত —

''কেন না তাই - বা আর কত দিনের? উত্তম বর্ণের দিন যদি গিয়ে থাকে, মধ্যম বর্ণেরও তবে যাবার মুখে—অতএব হিন্দুর আজ বিশেষ করে দরকার তথাকথিত অধম বর্ণকে; অন্ত্যজকে অন্তরঙ্গ না করলে কালের করাল গ্রাস থেকে তার রেহাই নেই।''[২৯]

শিবরাম সেই সঙ্গে সেইকালেই পরামর্শ দিয়েছেন এই ভাবে —

"অতএব হিন্দুকে যদি জাতি হিসেবে বাঁচতে হয়, তাহলে হরিজনদের স্বীকার করতেই হবে, কেবল ছোঁয়াছুঁয়ির আওতায় এনেই নয়, সামাজিক আত্মীয়তার স্বীকরণে—বৈবাহিক আদান-প্রদানে—রক্তের অঙ্গীকারে এক হয়ে।"[২৮]

সাম্যবাদী শিবরাম সমাজের নীচুস্তরের নিপীড়িত শোষিত শাসিত শ্রমজীবী অসহায় শূদ্রদের জাগরণ যেমন প্রত্যাশা করেছেন, তেমনই তাদের মানবসমাজে প্রভূত দানের ও অকৃত্রিম প্রভাবের কথা তুলেধরেছেন। মানুষে মানুষে বৈষম্য দূর করার জন্য হিন্দু ধর্মের বর্ণভেদ প্রথাকে সমূলে উৎপাটন করতে চেয়েছেন। তাই তাঁর অভিনব প্রস্তাব সকল শূদ্রকে ব্রাহ্মণ বলে নয়, সকল ব্রাহ্মণকে শূদ্র বলে ঘোষণা করা হোক। তাঁর ভাষায়—

" তাই, ঘোষণা যদি করতেই হয়, অব্রাহ্মণ নির্বিশেষে সবাইকে শূদ্র বলে ঘোষণা করাই ভালো, কেননা শূদ্র বামুনের চেয়ে মহত্তর জাত! 'মহত্তর' বললাম বলে কেউ যেন না মনে করেন যে, বামুনদের, জাত হিসেবে, আদৌ, আমি মহৎ বলে মনে করি।"[২৯]

এভাবে 'নারীর সঙ্গে পুরুষের, নিম্নস্তরের সঙ্গে উচ্চস্তরের, মানুষের সঙ্গে মানুষের মেলার অর্থগত, সমাজগত ও ধর্মগত হাজারো রকমের বাধা'কে শিবরাম অচলায়তনের সঙ্গে তুলনা করে তাকে ভেঙ্গে মুক্তপথ রচনার কথা বলেছেন। মানবপ্রেমিক শিবরাম তাঁর সাম্যবাদী মননশীলতার পরিচয় দিয়ে গণচেতনা জাগরণের প্রয়াস চালিয়েছেন সামাজিক প্রবন্ধগুলিতে।

সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ ঃ শিবরামের তিনটি প্রবন্ধগ্রন্থেই কমবেশি সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ রয়েছে। একমাত্র "ফানুস ফাটাই" প্রবন্ধ গ্রন্থটি তাঁর সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধের সংকলন। এতেও একাধিক রম্যরচনা বা রসরচনা রয়েছে তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধের মধ্যে সাহিত্যিক শিবরামের সাহিত্যরসবোধ ও সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর চিন্তাচেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। এই ধরনের অগ্রন্থিত একাধিক প্রবন্ধের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

বিশেষ করে আধুনিক নাটক সম্পর্কে তাঁর অভিমত প্রথমেই স্মরণীয়। 'আধুনিক নাটক' প্রবন্ধটি "আজ এবং আগামীকালে"র অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরে "ফানুস ফাটাই" গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই প্রবন্ধে শিবরাম আধুনিক নাটক সম্পর্কে তাঁর অভিনব বক্তব্য উপস্থাপনা করেছেন। তিনি মূলত আধুনিক বাংলা নাটক বিষয়েই গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর কথায় —

"আধুনিক নাটক সম্বন্ধে কিছু বলতে যাওয়ার একটা মস্ত অসুবিধা আছে, সেটা হচ্ছে আধুনিক নাটকের অনস্তিত্ব। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র হতে আধুনিক কথা-সাহিত্যিক পর্যন্ত উপন্যাস রচনার একটা সুনির্দিষ্ট অথচ বিভিন্নমুখী ধারার সন্ধান মেলে—তার বৈশিষ্ট্যও যেমন, বৈচিত্র্যও তেমনি। কিন্তু নাট্য-সাহিত্যের বেলায় তেমন-কিছু পাই না।"[৩০]

কারণ —

"নাট্য সাহিত্য রঙ্গালয়ের মুখাপেক্ষী হওয়ার ফলে এই হয়েছে যে নাট্যপ্রতিভা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারেনি—তাই তার না দেখি কৌলিকতা না কোন মৌলিকতা।"[৩০]

তাঁর মতে আধুনিক নাটকের অন্তত দুটি লক্ষণ থাকা চাই-- প্রথম, তার নাট্য রূপে বিশিষ্ট নূতনত্ব ; দ্বিতীয়, তার নাট্যরসে আজকের জীবনসমস্যা। নাট্যরূপ বলতে তিনি বুঝিয়েছেন "তিন-চার ডজন দৃশ্য না থাকলে এদেশে নাটক তৈরী হয়না, সেখানে আধুনিক নাটক একটি মাত্র দৃশ্যে সম্পূর্ণ হবে। এই নাটকের অভিনয়ে সময় লাগবে না বেশি এবং এর - ভেতর নাচ গানের অনাবশ্যক বাহুল্য থাকবে না আদপেই। স্থান-কাল-ঘটনার সঙ্গতি এত নিবিড় হবে যে নাট্যোল্লিখিত সময়ের মধ্যে কোনো বিচ্ছেদ ঘটবে না এবং শুরু হবার পরে, একেবারে গিয়ে যবনিকাপাত হবে—মাঝে কোনো সাময়িক বিরতি (interval) অবধি থাকবে না।"[৩০]

আর সেই সঙ্গে —

"এমনভাবে চরিত্র গুলিকে সঙ্গতি দিতে হবে যাতে তাদের স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ থাকবে—প্রত্যেককেই নাটকের মুখ্যপাত্র বা পাত্রী বলে মনে হয়, যেমন দেখি গোর্কির Lower Depths - এ।"[৩০] বিশেষকরে " আধুনিক নাট্যকার মানুষের কতকগুলো type না দেখিয়ে মানুষের life টাকেই বড় করে দেখাবেন।"[৩০] শিবরাম পরিশেষে আধুনিক নাটকের স্বরূপ তুলে ধরার প্রচেষ্টা করেছেন —

"জীবনের স্রোত বয়ে চলেছে—নরনারী তার ঢেউ মাত্র ; ঢেউকে একান্ত ভাবে দেখাবার কোনো মানে হয় না, ঢেউগুলিকে ততখানি ও তেমনি ভাবে দেখাতে হবে যাতে তরঙ্গলীলা অতিক্রম করে অখণ্ড জীবনধারার গভীর পরিচয় পাই। বিচিত্র কোণ থেকে বিচিত্র আলোকপাত করে সেই বিচিত্র আর অদ্ভুত জীবনকেই সম্পূর্ণভাবে দেখাতে হবে তার প্রতিদিনের ব্যর্থতা ও সার্থকতার মধ্যে। আর, তাই হবে আধুনিক নাটক।"[৩০]

আধুনিক নাট্য সন্ধানী পাঠকের কাছে এই প্রবন্ধের গুরত্ব অপরিসীম। সমালোচক দেবীপ্রসাদ ঘোষ

নাট্য সমালোচনা প্রসঙ্গে যথার্থই বলেছেন —

"পেশাদার মঞ্চ সম্পর্কে আর একটা বিষয় আমাদের জানা জরুরী। শিবরাম চক্রবর্তী ওই সময়ের গুরত্বপূর্ণ নাট্যব্যক্তিত্ব। যদিও পরের দিকে তাঁকে অন্যভাবে পরিচিত হতে দেখি। তিনি অন্য নাট্য আন্দোলনের হোতা। চলতি সময়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন 'আধুনিক নাটক' (১৯২৯) - এ যা প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন বর্তমান সময়েও সেটা সঙ্গতিপূর্ণ।"[৩১]

এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় এই প্রবন্ধে আধুনিক নাটকের প্রকৃতি বিষয়ে আলোচনায় শিবরাম কয়েকজন বিদেশী নাট্যকারের নাম উল্লেখ করেছেন। বিশেষ করে ইবসেন, বানার্ড শ, গলসোয়ার্দি এবং গোর্কি প্রমুখ। এরা প্রত্যেকেই কমবেশি সমাজের নীচুস্তরের নিপীড়িত মানুষের বঞ্চনার কথা তাঁদের নাটকে তুলে ধরেছেন। শিবরামও তাঁর অসাধারণ নাট্য প্রয়াস "চাকার নীচে" (১৩৩৫) ও "যখন তারা কথা বলবে" (১৯৩০) একঙ্কিকাদ্বয়ে সমাজের নীচুস্তরের মানুষের প্রতি এমন আচরণের বিরুদ্ধে গণচেতনা জাগরণের প্রয়াস চালিয়েছেন। এই প্রবন্ধটি ছাড়াও শিবরামের নাট্যবোধের পরিচয় মেলে পূর্বোক্ত 'গ্রেট থিয়েটার' ও 'উপসংহার' প্রবন্ধদুটিতেও। সমালোচক দেবী প্রসাদ ঘোষ 'গ্রেট থিয়েটার' প্রবন্ধটিকে 'অনুসন্ধানী ভাবনার প্রতীক' হিসাবে উল্লেখ করেছেন। তাঁর বিশ্লেষণী শক্তি ও অভিনব চিন্তা চেতনার পরিচয় মেলে নাট্যসংক্রান্ত প্রবন্ধগুলির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত।

'আধুনিক নাটক' প্রবন্ধ রচনার পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সাহিত্য ধর্ম' (বিচিত্রা, শ্রাবণ ১৩৩৪) ও 'সাহিত্যে নবত্ব' (প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৩৪) প্রবন্ধের সমালোচনা করে শিবরাম নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী প্রমুখের মতো 'সাহিত্যিক ধর্ম' ও 'সাহিত্যে অভিনবত্ব' নামে দুটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। একটি বিষয় লক্ষ করার মতো, তা'হল শিবরাম রবীন্দ্রনাথের গুণমুগ্ধ অনুরাগী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর সমালোচনায় দ্বিধাবোধ করেননি। তাঁর আত্মজীবনীতে একাধিকবার সশ্রদ্ধ রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ স্মরণ করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে জানিয়েছেন —

"রবীন্দ্রনাথ যেমন। একাধারে হ্রদ, নদী আর সমুদ্রের সমাহার। এপর্যন্ত মানুষের পরিণতিতে পরিপূর্ণ মানবতার ঠিক না হলেও, মানবিক পরিপূর্ণতার মাপকাঠি রূপেই ধরা যায় তাঁকে।"[৩২]

আবার অন্যত্র কথা প্রসঙ্গে বলেছেন —

"ওরে বাপরে , কত বড় মানুষ, কত বড় প্রতিভা, আমি ওঁর নাম উচ্চারণেরও যোগ্য নই।"[৩৩]

এমনকি প্রবন্ধ, উপন্যাস প্রভৃতিতে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি প্রতিভা সসম্মানে উপস্থাপিত করেছেন। অথচ কী প্যারডিতে, কী কবিতায় রবীন্দ্রনাথের অনেক বিষয়কে সমালোচনা করেছেন। প্রবন্ধেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর বাংলা সাহিত্যের প্রতিষ্ঠানস্বরূপ জেনেও ঐ তরুণ বয়সে তাঁর সমালোচনায় কলম ধরেছিলেন। শিবরামের প্রতিষ্ঠানবিরোধী মানসিকতার এও এক উল্লেখনীয় দৃষ্টান্ত। যেমন সামাজিক প্রবন্ধে তেমনই সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধেও শিবরামের রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা লক্ষণীয়। আশ্চর্যের বিষয় এসব প্রবন্ধেও শিবরামের সাম্যবাদী চিন্তাধারার পরিচয় সহজলভ্য —

" একচ্ছত্র সাম্রাজ্যের সবই ভাল, কেবল অকল্যাণ এই যে এক বনস্পতির আওতায় এমন অনেক অঙ্কুর বাড়তে পায় না যাদের বীজে বনস্পতিত্বেরই সম্ভাবনা ছিল। একজনের রক্ষণাবেক্ষণে সাহিত্য- ধর্ম সুনির্দিষ্টরূপে বজায় থাকে সন্দেহ নেই, কিন্তু বহুসাহিত্যিক-ধর্ম বিফল হয়। গতযুগে সৌর-সাম্রাজ্যের বহু গ্রহ-উপগ্রহই রবির অকৃপণ আলোক-ঋণ পেয়েছেন, কিন্তু তাঁদের দু-একজন মাত্র আজো ঝিক্‌মিক্ করছেন; অধিকাংশের আঁধারে ঘুরে মরাই সার! — এক শরৎচন্দ্রই গোত্রছাড়া কেবল তিনিই সেই ঋণ শোধ করতে পেরেছেন।"[৩৪]

প্রবন্ধেই নয়, রবীন্দ্রনাথের কাব্যসমালোচনার প্রকৃতিকেও সমালোচনা করেছেন শিবরাম - তাঁর ' আধুনিক সমালোচনা' প্রবন্ধে। আধুনিক সমালোচনার তিক্ত অভিজ্ঞতার ব্যঞ্জনা এই প্রবন্ধে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর কথায় —

"গল্প লিখতে হলে আর্টের দরকার, কিন্তু সমালোচনা লেখায় তার প্রয়োজন হয় না মোটেই; কেবল আর্টলেস নয় , হার্টলেস হলে তর পক্ষে আরো ভাল। সমালোচনার নিজের যদি কোনো মর্ম না থাকে অপরের মর্মভেদ করাই হয়ে ওঠে তার কাজ।"[৩৫]

দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্রথমেই শিবরাম রবীন্দ্রনাথের স্মরণ নিয়েছেন —

" এককথায় কোনো কবির কাব্য বিচার করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—এঁর কবিতায় পৌরুষের পরিচয় আছে। যাঁকে নিয়ে কথা, তিনি এই সার্টিফিকেট পেয়ে মোহিত হয়েছিলেন, কি লাল হয়ে ছিলেন, তিনিই জানেন,—কিন্তু কবিতার বিচারে এ কেমন কথা?

কবির কবিত্ব আছে কিনা, কবিতা কবিতা হয়েছে কিনা—এই ছিল প্রশ্ন। রবীন্দ্রনাথ বললেন — পৌরুষ আছে। উত্তর হয়ত খুব স্পষ্ট হলো—কিন্তু সম্ভবত খুব যথার্থ হলো না।"[৩৬]

আবার অন্যের রবীন্দ্রকাব্য সমালোচনা প্রসঙ্গে পণ্ডিচেরির পণ্ডিতমশায়ের প্রসঙ্গ তুলেছেন। এভাবে

তিনি যৌক্তিক পরম্পরায় প্রশ্ন রেখে প্রবন্ধটি শেষ করেছেন। আধুনিক সমালোচকদের সঙ্গে সঙ্গে শিবরাম আধুনিক পাঠকের স্বরূপ তুলে ধরেছেন। এখানেও রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি লক্ষ করা যায় —

"খাঁটি পাঠক পাননি, এরকমের মনোক্ষোভ ছিল রবীন্দ্রনাথের। অবশ্যি, বরাবর ছিলনা। কেননা সেই সব ঘোড়ার ডিমের রবীন্দ্র পড়ুয়ারা শেষ পর্যন্ত তাঁর লেখার ব্যাখ্যাকার হয়ে দাঁড়াল।"[৩৭]

তবে প্রবন্ধটিতে শিবরামেরই ভেজাল পাঠকের প্রকৃতি বিশ্লেষণ উপস্থাপিত হয়েছে।

শিবরাম চক্রবর্তী হাসির গল্প লিখেই সর্বাধিক জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন। তাঁর সেই জনপ্রিয়তা আজও অব্যাহত। এই হাসির গল্পের প্রকৃতি বিষয়ে তাঁর দুটি অসাধারণ প্রবন্ধ বর্তমান। একটি "মস্কো বনাম পণ্ডিচেরি"র (তৃতীয় সংস্করণ) 'হাসির গল্প হাসিল করা ' অপরটি 'হাসির গল্পের আঙ্গিক '। এই দুটি প্রবন্ধ থেকে সহজেই অনুভব করা যায় তিনি কত সচেতন ও সিরিয়াস হাসির গল্পকার ছিলেন। তাঁর কথায় —

" সিরিয়াস লেখকের কাজ হোলো যত জীবনসমস্যা—জীবনের যন্ত্রণাগুলি তুলে ধরা,আর কৌতুক - লিখিয়ের কাজ ভুলিয়ে দেওয়া তাবৎ যন্ত্রণা। হেসে উড়িয়ে দেয়া জীবনের যত জঞ্জাল। সিরিয়াস পাঠকের জন্য হাসির গল্প নয় । তিনি রৌরবের আসামী, মর্গের করোনার হাসির স্বর্গে প্রবেশাধিকার নেই তার। রহস্য নিবেদনম্ কেবল রসিকের কাছেই ।"[৩৮]

আবার —

"হাসির গল্প হাসির তো হবেই , কিন্তু তা গল্পও হওয়া চাই । সেই মৌলিক দায়ের উপর হাসিটা উপরি আদায়। কিন্তু হাসিয়েই কি লেখকের খালাস আছে? তাকে দেখতে হয় যে, হাসির হলেও লেখা যেন হাস্যকর না হয়। গল্পের আঙ্গিকে ইঙ্গিতে কোনো খুঁত থাকলে চলে না। লেখার কোনোখানে ফাঁকি থাকবে না, ফাঁক তালে মজা থাকবে।"[৩৯]

বর্তমানে প্রচলিত 'কিশোর সাহিত্য' বিষয়ে শিবরামের ভিন্ন মত উল্লেখনীয়। আসন্ন বাস্তবের মুখোমুখি হওয়ার সহায় স্বরূপ কিশোরদের বড়দের সাহিত্য তুলে দেওয়ার কথা বলেছেন তিনি। তাঁর অভিমত —

"অতএব, তুলেদিন তার হাতে বঙ্কিমচন্দ্র শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ। বিবেকানন্দ, বিভূতি বন্দ্যো তারাশংকর। হেমেন রায়ের সঙ্গে প্রেমেন মিত্রকেও।"[৪০]

পরবর্তীকালে চুটকিলেখক শিবরাম চুটকির সপক্ষে প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এই 'চুটকি লেখার চটক'

(আনন্দবাজার পত্রিকা, ১২ মার্চ১৯৬১) প্রবন্ধে চুটকির কালজয়িতা প্রসঙ্গে সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমতকে শিবরাম নিপুণ যৌক্তিকতায় খণ্ডন করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর অভিব্যক্তি উল্লেখনীয় —

"সাতখণ্ডের মহৎ কীর্তির মত মাথার বোঝাই করার নয়, নত হয়ে বোঝার মতন মাথায় করে বইবার না, ছোট্ট কয়েকটি কথা, লোকের মুখেই ফেরে। আদরের ছোঁয়ার মতোই । বই পড়ে নয়, অপরের প্রমুখাৎ তা আমরা অবগত হব। কার কথা, কে বলেছে, কবেই বা- তার কোনো ঠিকানা নেই কো; যে বলবে যার সম্মুখে তার কাছে তা তখনকারই বুদবুদ—নিত্যকালের চিত্তহারী চিরন্তন। বহুকাল ব্যেপে ভল্যুমে ভল্যুমে নয় , পলে পলেই তার মালুম।"[৪১]

কয়েকটি ভিন্নধর্মী প্রবন্ধে যথা 'কবিতা রান্না', 'শব্দযোগ', 'কবিতার উপসর্গ' প্রভৃতিতে কত সহজে জটিল বিষয়কে সরস করে উপস্থাপনা করা যায় তাই শিবরাম দেখিয়েছেন। তিনি যে শুধুমাত্র হাসির গল্পকারই নন, সরস প্রবন্ধ রচনাতেও তাঁর স্বাতন্ত্র্য রয়েছে তা উদ্দিষ্ট প্রবন্ধত্রয়ই যথেষ্ট বলে মনে করি। যেমন দৃষ্টান্ত স্বরূপ —

"প্রত্যেকটি শব্দের জন্য একটি করে মোহরের বরাদ্দ থাকলেও, যিনি প্রয়োজনের বেশি একটিও শব্দও যোগ করেন না, তিনিই শব্দযোগী ; তাঁর সাহিত্যে - তপস্যা সিদ্ধ হবেই।" (শব্দযোগ)[৪২]

অথবা —

"কবিতা কেউ লেখেনা, লিখতে পারে না। কবিতা এসে ঘাড়ে চাপে, ঘাড় ধরে নিজেকে লিখিয়ে নেয়। অলক্ষ্য থেকে অভাবিত এসে পড়ে। কবি তাকে পাড়ে না, সেই এসে কবিকে পেড়ে ফেলে।"(কবিতা রান্না)[৪২]

কিংবা —

"যন্ত্রণা না হলে যেমন একালে কবিতা হয়না, তেমনি আমার ধারণায় আগামী কালে যন্ত্র না হলে কবিতা হবে না। যন্ত্রণা কবিদের পরবর্তী যুগে যন্ত্রকবিরা দেখা দেবেন। কম্প্যুটার যন্ত্রের সাহায্যেই লিখিত হবে কবিতা।" (কবিতার উপসর্গ)[৪৩]

আর একটি ব্যতিক্রমী প্রবন্ধ 'শিল্পীর স্বাধীনতা'। এটি পূর্বোক্ত সামাজিক বা সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধ-শ্রেণিদ্বয়ের মধ্যে পড়ে না। দীর্ঘ প্রায় বত্রিশ বছর পরে চীন-ভারত যুদ্ধের (১৯৬২) সময় লেখা প্রবন্ধটিতে শিবরাম পূর্বের সাম্যবাদ সংক্রান্ত চিন্তা-চেতনার পুনর্মূল্যায়নে ব্রতী হয়েছেন। তাঁর কথায় —

"ইতিমধ্যে আড়াই যুগ পার হয়ে গেছে, অনেক জল গড়িয়ে গেছে তার পর। নতুন টেকনিক নিয়ে

গান্ধীজীর আবির্ভাব হয়েছে। নিরস্ত্র প্রতিরোধের পথে ভারত স্বাধীনতা অর্জন করেছে। স্বাধীন রাষ্ট্র হয়ে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু করতে চলেছে। পৃথিবী থেকে উপনিবেশবাদ প্রায় উঠে গেছে, আফ্রো - এশিয়া আজ স্বাধীন।

ইংলন্ডপররাজ্য-লিপ্সা ত্যাগ করে ওয়েলফেয়ার স্টেট হয়ে উঠেছে। ধনতন্ত্রও তার মতিগতি পাল্টেছে; আমেরিকায় তা কেবল সমাজকল্যাণ রূপ নয়, বিশ্বকল্যাণ ব্রত নিয়েছে।

কিন্তু রাশিয়ায় কমিউনিজম পুরোপুরি সফল হয়নি। চীনে তা ব্যর্থ হয়েছে। ..... রাশিয়ায় প্রত্যেকেরই রুটি জুটেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু তার বেশি নয়।''[৪৪]

এ প্রসঙ্গে সমালোচক পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য উল্লেখ্য —

''ভারতীয় আত্মিক - সাম্যের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের আর্থিক সাম্যের সাম্যনীতির আত্মীয়তা ঘটলেই বিশ্বজনীন সাম্যবাদের সাফল্য ঘটতে পারে। আর ঐ ১৯২৯-৩০ - এ তার আশা ছিল ''ঘটবেও তাই।'' বলাই বাহুল্য, তা ঘটেনি, কোথাও ঘটেনি। গান্ধীবাদের অপমৃত্যু শিবরাম তো নিজেই জীবৎকালে দেখে গেছেন। বলার কথা, সাম্যবাদ বা সমাজতন্ত্রবাদের একটা দেশীয় শিকড় তিনি খুঁজতে চেয়েছিলেন।''[৪৫]

শিবরাম অবশ্য তার কারণও তুলে ধরেরেছেন —

''চালাকির দ্বারা যেমন মহৎ কাজ হয়না তেমনি জবরদস্তির দ্বারাও নয়। জুলুমের দ্বারা চালাতে গিয়ে রাশিয়ার ইকনমিক প্ল্যানিং ব্যর্থ হল। মাথা কেটে বাদ দিয়ে মানুষকে বাধ্য করা যায় বটে, কিন্তু তার পর আর সে দাঁড়াতে পারে না, চলবে কি! দাস করে মানুষকে মুক্ত করা যায় না, বশ্যতার পথে অবশ্যই তার স্ফূর্তি নেই।''[৪৬]

কিন্তু মার্কসীয় সাম্যবাদ একে বারে বিফল যেমন তিনি মেনে নেননি, তেমনই তাঁর অটল বিশ্বাস তখনও অব্যাহত ছিল —

''সাম্যবাদ ভারতেরই ধারা। তার সঙ্গে ভারতের কোন বিরোধ নেই, বিবাদ কেবল তার প্রয়োগরীতি নিয়ে। ..... সমস্ত মানুষের সমত্ব আর মানুষের প্রতি মমত্ব—এই-বোধের দৃষ্টি এখানে এতই সহজ যে, তার জন্য মার্কসীয় দর্শনের অপেক্ষা রাখে না।''[৪৭]

শিবরাম চক্রবর্তী যে আন্তরিকভাবেই সাম্যবাদে বিশ্বাস করতেন এবং স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে গণচেতনাধর্মী সামাজিক প্রবন্ধে প্রকাশ করেছিলেন ও বিশ্বাসে অবিচল ছিলেন-তাতে সন্দেহ নেই। সমালোচক পল্লব সেনগুপ্ত প্রসঙ্গক্রমে বলেছেন —

''আসলে সেই যে 'মস্কো বনাম পণ্ডিচেরি' বইয়ের প্রথম প্রকাশিত রূপ আজ এবং আগামী কাল-এর মধ্যে তাঁর সাম্যবাদী (এবং প্রতিবাদী) মনটি আত্মপ্রকাশ করেছিল, সেই প্রবণতাটাই তাঁর সারাজীবন সজীব ছিল। এই অনবচ্ছিন্ন এস্টাবলিশমেন্ট বিরোধিতা তারই পরিচয় দেয়। এমন কী, ১৯৬২-র চীন ভারত যুদ্ধের সময় দেশপত্রিকার মালিকদের চাপে পরে 'শিল্পীর স্বাধীনতা' পর্যায়ে কম্যুনিজ্‌ম - সম্পর্কে কিছু অকরুণ মন্তব্য করতে বাধ্য হয়েছিলেন বটে তিনি, কিন্তু ঐ-বিচ্যুতিটুকুকে বাদ দিলে আজীবনটাই কিন্তু সাম্যবাদের মূল সত্যের প্রতি নিজের প্রতীতি বজায় ছিল শিবরামের। সেই গণমুখিনতাই তাঁকে আন্তরিক ভাবে এমন এস্টাবলিশমেন্ট-বিরোধী করে রেখেছিল।''[৪৮]

অথচ সাম্যবাদী গণচেতনাধর্মী সামাজিক প্রবন্ধ রচনায় সার্থকতা লাভ করেও সেপথে আর অগ্রসর হননি শিবরাম। যদিও কিছু সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ লিখেছিলেন কিন্তু গণচেতনাধর্মী প্রবন্ধে কলম ধরেননি বললেই চলে। সমালোচক মলয় বসু বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছেন —

''যে শিবরাম চক্রবর্তীকে আমরা পরবর্তীকালে তাঁরই উচ্চারণে শিব্রাম চক্কোত্তি বলে জেনেছি, তাঁর লেখায় যমক ও শ্লেষ ব্যবহারের দক্ষতা দেখে বিস্ময় মেনেছি। মূলত হাসির গল্পের লেখক বলে যাঁকে ধরে নিয়েছি—ভাবতে বিস্ময় লাগে বিংশ শতাব্দীর ২০-৩০ এর দশকে সেই শিবরাম চক্রবর্তী মার্কসবাদের সপক্ষে, রুশবিপ্লবের সপক্ষে, লেনিনের সপক্ষে রুখে দাঁড়িয়ে অভ্রান্ত বিশ্লেষণে বিরোধী - সমালোচকদের সমালোচনাকে খান্ খান্ করে দিয়েছিলেন। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় সেই যুগে শিবরাম চক্রবর্তী অনেক মূল্যবান প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। বাংলা দেশের মার্কসবাদের তাত্ত্বিকযোদ্ধা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।''[৪৯]

অর্থাৎ সিরিয়াস প্রাবন্ধিক শিবরাম চক্রবর্তীর লেখকসত্তার বাক্ পরিবর্তন তথা গণচেতনা থেকে রসিকতার জগতে পদার্পণকে স্বাভাবিক ভাবে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনেও তাঁর পরিবর্তন এসেছিল বলে প্রাবন্ধিক অশোক মিত্র মনে করেন। তাঁর ভাষায় —

''শেষের দিকে তো শিবরাম চক্রবর্তী আমাদের মতোই ফের ভদ্দরলোক হয়ে গিয়েছিলেন।''[৫০]

শিবরাম কতবড় প্রাবন্ধিক ছিলেন তার চেয়ে বোধ হয়, আরও বড় প্রশ্ন তাঁর প্রবন্ধ-বিষয়ের প্রাসঙ্গি-কতা। এ বিষয়ে অধিকাংশ সমালোচক উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে প্রাবন্ধিক শিবরাম চক্রবর্তীর শক্তিমত্তার প্রতি

বিস্ময় প্রকাশ করেছেন—সেকথা পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাবন্ধিক ভূপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য দৃঢ়প্রত্যয় ব্যক্ত করে বলেছেন —

"আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস—উত্তরজীবনে তিনি গুরুগম্ভীর রচনা থেকে যদি সরে না যেতেন তাহলে পরিণত বয়সের প্রজ্ঞার আলোকে বাংলার প্রবন্ধ-সাহিত্যকে আরো বহুমূল্য রত্নরাজি উপহার দিয়ে যেতে পারতেন।"[৫১]

কিন্তু যা শিবরাম চক্রবর্তী দিয়েগিয়েছেন তাও কম নয়—তা বলাই বাহুল্য।

গ) নাট্যকার শিবরাম

নাট্যকার শিবরাম চক্রবর্তীর বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের দ্বিতীয়ার্ধে একটি বিতর্কিত পরিচিতি ছিল। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দেনাপাওনা' (১৯২৩) উপন্যাসের নাট্যরূপ ষোড়শীকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত বিতর্কের ঝড় একাধিক পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে পড়েছিল। ঐ তরুণ বয়সে শিবরাম একদিকে যেমন তাঁর নাট্য ভাবনার পরিচয় রেখেছিলেন বিভিন্ন প্রবন্ধাদিতে, তেমনি মৌলিক নাট্য রচনায়ও ব্রতী হয়েছিলেন। যেমন ছিল তাঁর নাটক বিষয়ে লেখা সিরিয়াস প্রবন্ধের অভিনবত্ব, তেমনই ছিল নাটকের বিষয় সচেতনতা।

বাংলা নাটকে শিবরাম চক্রবর্তীর আর্বিভাব ঘটেছিল নাট্যরূপকার হিসাবে। এক সময় নরওয়ের সুখ্যাত নাট্যকার হেনরিক যোহান ইবসেন (১৮২৮-১৯০৬) বাংলা নাট্যসাহিত্যকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করেন। নাট্যবেত্তা অজিতকুমার ঘোষের কথায় —

"দ্বিজেন্দ্রলালের সমসাময়িক নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে পরবর্তী বহু নাট্যকার ইবসেনের বৈপ্লবিক চিন্তাধারা ও নাট্যরীতি দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। হেনরিক ইবসেন আধুনিক বাস্তববাদী নাটকের প্রবর্তন করেছিলেন। সেজন্য বাংলা নাটকে ও নাট্যাভিনয়ে যখন থেকে বাস্তব ভাবনা, সংশয় ও প্রতিবাদ, ও বাস্তব উপস্থাপনারীতি শুরু হ'ল তখন থেকে ইবসেনের প্রভাব ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করা গেল।"[১]

এ সম্পর্কে ড. নরেশচন্দ্র খাঁ-র বক্তব্য হল —

" আজও বাংলা নাটকের অগ্রগতি ইবসেনকে ভিত্তি করেই, বর্জন করে নয়। বাংলা নাটকে ইবসেনের প্রভাবের দুটি দিক—একটি ভাবগত এবং অপরটি শিল্পগত।"[২]

ড. খাঁ আরও জানিয়েছেন —

'' নাট্যসাহিত্যে বৈপ্লবিক চিন্তাধারা প্রবর্তনের দিক থেকে ইবসেন চিরস্মরণীয়। প্রচলিত সামাজিক রীতি-নীতি সংস্কার ও অনুশাসন, পারিবারিক মূল্যবোধ, ধর্মীয় বিধিনিষেধ প্রভৃতি ক্ষেত্রে তাঁর চিন্তাধারা ছিল অতীতের ঐ জাতীয় চিন্তাধারা থেকে যথেষ্ট পৃথক। এক কথায় বলা যায় চিন্তা জগতে তিনি অতীত এবং ঘটমান বর্তমান বা আসন্ন ভবিষ্যতের মধ্যে এক বিরাট ব্যবধান তৈরী করে গেছেন।''[৩]

শিবরাম চক্রবর্তী ইবসেনের নাটকের বিষয় ও আঙ্গিকের দ্বারা প্রভাবিত হয়েই ''দেনাপাওনা'' উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়েছিলেন। অবশ্য এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে তাঁর ''ছেলে বয়সে'' (১৯২৫) উপন্যাসের সঙ্গে বিজ্ঞাপিত তিনটি গ্রন্থের মধ্যে একটি নাটকেরও নাম ছিল। 'সমাজ সমস্যামূলক অভিনব নাট্যরচনা' বলে বিজ্ঞাপিত নাটকটির নাম ''যৌবনের অপচয়''। অথচ এই নামে শিবরামের কোনো নাটক প্রকাশিত হয়নি। সেজন্য নাট্যরূপকারই নাট্যকার শিবরামের আদি পরিচয় হিসাবে গণ্য করা হয়। তাঁর কথায় —

''আমার তরুণ বয়সে ইবসেনের নাটক পড়ে বিষয়বস্তুতে তো বটেই, আরো বেশি করে তাঁর রচনার টেকনিকে আমি অভিভূত হয়েছিলাম।

আমাদের দেশে সেকেলে থিয়েটারের পালা পাঁচ অঙ্কে অসংখ্য গর্ভাঙ্কে বহু পাত্র পাত্রী এবং সুদীর্ঘ দেশকালে বিস্তৃত বেশ এক গন্ধ মাদনী কাণ্ডই ছিল। সেখানে অল্প সময়কালে ঘনবিন্যস্ত ইবসেনের নাটকগুলি স্বভাবতই চমকিত করেছিল আমায়।

বাংলায় কি এমনটা করা যায় না?

আমার মাথায় তখনও মৌলিক নাট্যরচনার কোনো প্লট দানা বাঁধেনি। শরৎ চন্দ্রের দেনাপাওনা সে সময় সবে 'ভারতবর্ষে' বেরিয়েছে। আমার মনে হল ওই উপন্যাসটিকে নিয়ে এ ধরনের নাট্যরূপের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা যায় বোধ করি। .....

যাই হোক, ইবসনি কায়দায় সেই বিস্তৃত বইকে চার অঙ্কের—প্রত্যেক অঙ্ক একটিমাত্র দৃশ্যে সম্পূর্ণ—নাট্যাকারে ঘনসম্বন্ধরূপে দাঁড় করানো গেল।''[৪]

কিন্তু তাঁর নাট্যরূপ অবিকৃত অবস্থায় ছাপানো হয়নি। তৎকালীন 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদক মণ্ডলীর অন্যতম সদস্য সাহিত্যিক সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় লিখেছেন —

''শরৎচন্দ্র সে-লেখা আগাগোড়া দেখে পরিমার্জ্জনা করে দিলেন এবং তাঁর নামেই 'ষোড়শী' ছাপা হলো 'ভারতীর' এক সংখ্যাতেই সমগ্রভাবে।''[৫]

শিবরাম ''দেনাপাওনা''র নাট্যরূপ দিয়ে পাণ্ডুলিপিটি প্রখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্ব শিশির কুমার ভাদুড়ীকে দেখতে দিয়েছিলেন। কিন্তু 'শিশির বাবুর মনে ধরল না' এবং 'ভারতী' পত্রিকায় 'নাট্যরূপান্তর সাধনের জন্য তার কোথাও আমার নামগন্ধ ছিল না' বলে শিবরাম দুঃখ প্রকাশ করেছেন। একটি বিষয় উল্লেখ্য তা'হল শিবরাম রচিত এবং 'ভারতী'তে প্রকাশিত (১৩৩৩-এর আশ্বিন সংখ্যা) ও নাট্যমন্দিরে অভিনীত (২১ শ্রাবণ ১৩৩৪) তিনটি নাট্যরূপই যে আংশিক স্বতন্ত্র তা শিবরাম ও সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের কথাতেই ব্যক্ত। ''ষোড়শী''র জন্য প্রাপ্য স্বীকৃতি ও প্রত্যাশিত অর্থ প্রাপ্তি উভয়দিক থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন তিনি। এই নাট্যরূপকে কেন্দ্র করে তাঁর মানসিক আঘাত সম্পর্কে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই শিবরাম জানিয়েছেন —

''সত্যিই এই ব্যাপারটা আমার কাছে ভারী মর্মান্তিক ঠেকেছিল তখন। এবং স্বভাবতই শরৎচন্দ্র আর শিশির কুমারের প্রতি আমার রাগ হয়েছিল দারুণ।''[৬]

কিন্তু এই রাগের বহিঃপ্রকাশ ঘটে সরাসরি প্রবন্ধে এবং পরোক্ষভাবে নাটকে। প্রসঙ্গক্রমে বিষয়টি আলোচনা করা যেতে পারে।

বছর খানেকের মধ্যে সাপ্তাহিক 'নাচঘর' পত্রিকায় দশ সপ্তাহ ধরে প্রকাশিত হয় শিবরামের প্রথম নাট্যপ্রয়াস ''চাকার নীচে'' (১৩৩৫)। 'নাচঘর' পত্রিকার সম্পাদক হেমেন্দ্র কুমার রায় নাটকাটির ভূমিকায় লিখেছিলেন —

''একটি মাত্র অঙ্কে একটি মাত্র ঘরের ভিতরে, মোট তিন চার ঘন্টা সময়ের মধ্যে তিনি আধুনিক জীবনের যে বিচিত্র রসবহুল, অপূর্ব ও জীবন্ত চিত্র অঙ্কন করেছেন, আমরা আগে থাকতে আভাস দিয়ে তার রসভঙ্গ করব না।''

এছাড়াও এই পত্রিকায় একজন পাঠক শ্রী সুবর্ণলতা মুখার্জীর প্রকাশিত চিঠিতেও নাটকটি সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ব্যক্ত হয়েছে—'কেবল রূপ ও রসের নতুনত্বেই নয়, সবদিক দিয়েই এই বইখানা নব নাট্যযুগের অগ্রদূত।' সবশেষে তিনি লিখেছেন—'আধুনিক লেখকদের মধ্যে শিবরামবাবু নতুনত্বের পুরোহিত।' তবে শিবরামের মধ্যে 'পুরাতন বিদ্বেষকে' তিনি নিন্দা করেছেন।

'এক অঙ্ক এবং একটি মাত্র দৃশ্যে সম্পূর্ণ, উপস্থিত সমস্যা সঙ্কুল এই সামাজিক নাটকটি নাচঘরে' প্রকাশেরও 'কয়েক বছর আগেকার রচনা'। আরও জানা যায় নাটকটি মনমোহন থিয়েটারে অভিনয়ের পরিকল্পনা

হয়েছিল। নাটকটির একদিকে সমাজরূপ চাকার স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে, অন্যদিকে শোষণ-শাসন মুক্ত স্বাধীন মানুষের কথাও উপস্থাপিত হয়েছে। অবিবেচক নিষ্ঠুর পিতার অমানবিক ব্যবহারে বিতাড়িত অসহায় মা ও তাঁর পরের পক্ষের ভাই বোন শেষাদ্রি ও নমিতাকে নিরন্তর সন্ধানরত হোষ্টেলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট শৈলেশ্বর বসু যৌবন অতিক্রান্ত হলেও অবিবাহিত রয়েছেন। তার সঙ্গে থাকে দাদার শালী অতসী ও মাসতুতো ভাইয়ের ছেলে যক্ষ্মারোগাক্রান্ত অনিন্দ্য। নমিতা কিঙ্কর সরকারকে বিবাহের পূর্বে শৈলেশ্বরকে না জেনে ভালোবাসতো। দুটি সন্তানই শৈশবেই মারা যায় নমিতার। পারিবারিক অশান্তির জেরে এবং সন্তান লাভ করে নতুন জীবন গড়ার স্বপ্ন দেখে কিঙ্করকে পরিত্যাগ করে পূর্বের প্রেমিক শৈলেশ্বরের নিকটে আসে। পরিশেষে ঘটনাচক্রে তিনভাই বোনের মিলন হয় এবং নমিতা - কিঙ্করও ফিরে পায় তাদের দাম্পত্য জীবন। নাটকটিতে দুটি মৃত্যুর কথা রয়েছে। প্রথমটি এক বৃদ্ধ ভিখারীর রাস্তা পারাপারের সময়, অন্যটি অনিন্দ্যর, দার্জিলিং ভ্রমণে যাওয়ার পথে। এখানে নাট্যকারের সূক্ষ্ম দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম মৃত্যুটি একজন 'বুড়ো ভিখিরি' যার সম্পর্কে নাট্যকার শৈলেশ্বরের কণ্ঠে জুগিয়েছেন —

"বেচারা অনেকদিন থেকেই চাকার নীচে পড়েছে, আজ শুধু ওর জীর্ণ দেহটা পড়ল বৈ তো নয়।"[৭]

দ্বিতীয়টি অল্প বয়স্ক দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত অথচ তারও মৃত্যু চাকার নীচে। ডাক্তারের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে—"আমি তাকে বাঁচাতে পারলাম না। কচি বুক, আর ভারী চাকা।"[৮]

প্রথমজন সমাজরূপ চাকায় দীর্ঘদিন দলনের অভিজ্ঞতা নিয়ে মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছে, অন্যজন অকালেই বন্ধনহীন জীবনের সন্ধানে নেমে চিরতরেই হারিয়ে গেল।

এই নাটিকাটিতে শিবরাম ইবসেনের নাট্যপ্রকৃতির দ্বারা অনেকটাই প্রভাবিত হয়েছেন—তা একটু সচেতন হলেই উপলব্ধি করা যায়। ইবসেনের নাটককে সমস্যামূলক বলা হয় কারণ এতে রোমান্টিক বিষয় না থেকে বাস্তব জীবনের জটিল সমস্যাগুলিই সন্নিবেশিত রয়েছে। শিবরাম "চাকার নীচে" নাটকটিকে 'উপস্থিত সমস্যা মূলক' সামাজিক নাটক বলে অভিহিত করেছেন। ইবসেন তৎকালীন পুরুষ শাসিত সমাজে নারীর অবস্থার বাস্তব প্রতিফলন ঘটিয়েছিলেন তাঁর নাটকে। তিনি তাদের মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন এবং সেই সঙ্গে আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতেও। তারই ফসল "The League of Youth" (1869), "A Doll's House" (1879) এবং "Ghosts" (1881) প্রভৃতি নাটক। ইবসেনই প্রথম নাট্যসাহিত্যে নারীর অধিকারের কথা সর্বসমক্ষে তুলে ধরেছেন। বিশেষ করে "A Doll's House" নাটকে নোরা তার স্বামী হেলমারের "First and foremost, you are a wife and mother." কথার প্রতিবাদে বলে ওঠেন - " That I don't believe that any more. I believe that first and foremost I am an individual, just as much as you are — or at least I'm going to try to be." (Act III).

স্বামীও অনড়। হেলমারের ধারণা নোরা পৃথিবীর নিয়ম কানুন জানে না। তাই নোরার আত্মানুসন্ধিৎসা "I must try to discover who is right, society or me." (Act III)

কিংবা "Ghosts" নাটকে প্যাস্টর ম্যানদারস মিসেস আলভিংকে জানিয়েছেন — "It's not a wife's place to judge her husband." (Act I)

মিসেস আলভিং সবকিছু উপলব্ধি করে বলেছেন –"Law and Order — they're the cause of all the trouble in the world." (Act - II)

তাই তার স্বাধীন হওয়ার সদিচ্ছা — "I must some how free myself." (Act-II)

এভাবে ইবসেন তাঁর নাটকে পুরুষ শাসিত সমাজের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদেরও সুর ধ্বনিত করেছিলেন।

শিবরাম তাঁর "চাকার নীচে" একাঙ্ক নাটকে মনুবাদী সনাতন হিন্দু সমাজে নারীর করুণ অবস্থার কথা ব্যক্ত করেছেন। পুরুষ শাষিত সমাজে নারীর অসহায়তার বাস্তবচিত্র সুনিপুণ দক্ষতার সঙ্গে নাট্যকার শিবরাম তুলে ধরে গণচেতনা জাগরণের প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। এই সমাজে স্বামী পরিত্যক্ত কোনো স্ত্রী নাবালক সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার অর্থ 'ছেলে চুরি' করে পালানো। তাই নাট্যকার নমিতা ও অতসীর সংলাপে ফুটিয়ে তুলেছেন নারীদের সামাজিক অবস্থান —

নমিতা। এমনি অদ্ভুত ব্যাপারেই তো তোমাদের সমাজ আর সংসার আর তোমাদের আইনের পুঁথি বোঝাই। ছেলেটার বাবা তার মাকে তালাক দিয়েছে, তাই তোমাদের আইন বলছে—ছেলেটা যার খেয়ালের সৃষ্টি হলো তারই, আর যার রক্ত-মাংসের—তার নয়। এ বিষয়ে মুসলমান ও হিন্দু আইনের একই ধারা।

অতসী। এই দুর্ভাগা দেশে মনুর সত্ত্ব যে মনুষ্যত্বর চেয়ে বড় দিদি![৯]

শিবরাম অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে হিন্দুসমাজে পিতা পৃথক হলেও একই মায়ের সন্তান - সন্ততির মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্কের কথা তুলে ধরে নিষ্ঠুর বাস্তবের মুখোমুখি যেমন করেছেন, তেমনই নারীর সতীত্ব বিষয়ে সচেতন করেছেন —

কিঙ্কর। শৈলেশ আমার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করতে পারে আর আমি তার জন্যে পারিনে?

নমিতা। পারলে সুখের, কিন্তু সত্যি কথাটা শুনেই কোরো। তোমার সঙ্গে বিয়ের আগে শৈলেশের সঙ্গে আমার বিবাহ হয়েছিল, কাজেই ন্যায়ের দিকে থেকে আর সামজিক নিয়মেও আমাদের বিবাহ সিদ্ধ হতে পারে না।

কিঙ্কর (কিছুমাত্র আশচর্য না হইয়া)। সিদ্ধ না হোক, আমাদের বিবাহটা কাঁচাই রইল; কিন্তু আমরা এতদিন একত্র ঘর করবার পর যদি পরস্পরকে পর করি, তাহলে আমার আর কি! তুমিই সমাজের চক্ষে পতিতা বলে গণ্য হবে।

নমিতা। তোমার কথায় আমার ছেলেবেলার একটা কথা মনে পড়ল। রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলুম, এক জায়গায় পিছল ছিল, পড়ে গেলুম। চারিদিকের লোক দাঁড়িয়ে হাসতে লাগল, সমালোচনা করতে লাগল, আমার পা মচকে গিয়ে উঠতে পারছিলুম না, কিন্তু কেউ উঠতে সাহায্য করল না। সহসা একজন বুড়ো ভদ্রলোক এসে আমাকে বললেন, বাছা, পরে গেছ—তুমি পতিতা। ব্যথা করছিল বলেই হোক বা তাঁর কথা শুনেই হোক আমি কাঁদতে লাগলুম। তিনি আমাকে তুলে ধরে বললেন, এই যে দাঁড়িয়ে গেছ, আর তুমি পতিতা নও। আমি সেই কথাই তোমাকে আজ বলি, এতদিন পতিতা ছিলুম বটে, কিন্তু এখন দাঁড়িয়েছি, আর আমি পতিতা নই। এখন রাস্তা দিয়ে যারা চলছে তাদেরই একজন আমি।[১০]

শুধু তাই নয়, এসেছে সংস্কারাচ্ছন্ন সমাজান্তর্গত আরও বিভিন্ন নারীজীবনের প্রসঙ্গ —

শৈলেশ্বর। সেকথা নমিতা, তুমি বুঝবে না। আমাদের এই সনাতন ধর্মে অন্য সমাজের মতো বিবাহচ্ছেদের ব্যবস্থা নেই যে একজন পরিত্যাগ করলেই আরেকজন তাকে গ্রহণ করতে পারে।

নমিতা। একদল মেয়ে রক্ষিতা, আরেক-দল সুরক্ষিতা তফাৎটা কি তুমি খুব বেশি বলে ভাবো?

শৈলেশ্বর। নমিতা, তুমি পাগল! তফাত কোথায় এখন তুমি বুঝবে না - যে দশ জনের মধ্যে বাস করতে হবে তারাই একদিন বুঝিয়ে দেবে। .....[১১]

শিবরাম অবশ্য এই নাটকে পুরুষের কণ্ঠেও নারীর অসহায় অবস্থার কথা ব্যক্ত করেছেন। শৈলেশ্বর

তার অভাগা মায়ের ছন্নছাড়া জীবনের কথোপকথনের সময় নমিতার কথায় ব্যক্ত সমাজের অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া পাপচক্র বিষয়টিকে সমর্থন করে জানিয়েছেন —

"পাপচক্রই বটে নমিতা, পাপচক্রই বটে! নিত্যই তো সমাজের চাকার তলায় এরকম কত প্রাণই পিষ্ট হচ্ছে আমরা দেখি, কিন্তু খবরও রাখিনা! দশজন একজোট হলেই কি একজনকে পিষবার তাদের অধিকার জন্মায়?"[১২]

ইবসেনের মতো শিবরামও মানবমুক্তির বিষয়টি প্রাধান্য দিয়েছেন। সাম্যবাদী শিবরাম মুক্তিকামী মানুষের প্রতি সহানুভূতি ব্যক্ত করেছেন। শৈলেশ্বর বলেছে —

" ঝড়ের বিপ্লব ইতিহাসে অনেক হয়েছে, তাতে জঞ্জাল দূর হয়নি, এক জায়গা থেকে সরে অন্য জায়গায় দাঁড়িয়েছে মাত্র। (একটু থামিয়া) জানো শেষাদ্রী, চাই আলোর বিপ্লব—গান্ধীজীর সত্যাগ্রহই সেই পথ।"[১৩]

এখানে উল্লেখ্য শিবরাম চক্রবর্তী গান্ধীজীর আদর্শকে শ্রদ্ধা করতেন, সেকথা "আজ এবং আগামীকাল"(১৯২৯)-এর ভূমিকায় লিখেছিলেন। শিবরাম তৎকালীন স্বাধীনতা আন্দোলনে আত্মত্যাগী বিপ্লবীদের দেশপ্রেমকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। বিপ্লবী শেষাদ্রী স্বাধীনতা আন্দোলনে উত্থিত বিষ পান করে আত্মাহুতি দিতেও দ্বিধাগ্রস্ত হয়নি—"কিন্তু যদি কোনোদিন অমৃত ওঠে তার অধিকারী হবে আমার সমস্ত দেশবাসী।"[১৪]

নাটিকাটির পরিসমাপ্তিও ইবসেনীয় নাট্যাঙ্গিকে শেষ হয়েছে । "A Dolls House"-এর মতো 'অমীমাংসিত' ভাবেই শিবরাম নাটিকাটি শেষ করেছেন। অনিন্দ্যর অকাল মৃত্যুতে শোকাহত শৈলশ্বরের আত্মজিজ্ঞাসায় নাটিকার যবনিকা পড়েছে—"যা অন্ধকার! কোথায় আলো অতসী, কোথায় আলো?"[১৫]

শিবরাম নিজেও তারএই নটিকাটিকে মৌলিক নাটক হিসাবে উল্লেখ করেন নি। তাঁর কথায় —

"আমার প্রথম মৌলিক নাটক 'যখন তারা কথা বলবে' বেরয় নবশক্তিতে।"[১৬]

গণচেতনাধর্মী একাঙ্কিকা "চাকার নীচে" বিষয় বৈচিত্র্যে অভিনব হলেও গঠনগত দিকথেকে দুর্বল একাঙ্ক হিসাবে চিহ্নিত করেছেন ড. কৃষ্ণলাল ভট্টাচার্য। তাঁর কথায় —

"স্থান ঐক্য, কাল ঐক্য দৃঢ়ভাবে অনুসৃত। কিন্তু বিষয় ঐক্যে যথেষ্ট শিথিলতা রয়েছে। সুতরাং

আমরা একে দুর্বল একাঙ্ক বলে চিহ্নিত করতে পারি।"[১৭]

তৎসত্ত্বেও গণচেতনাধর্মী নাটিকাটি যে নাট্যামোদী সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল তা বলাই বাহুল্য।

১৯২৯ সালে 'নাচঘর' পত্রিকাতেই শিবরামের 'আধুনিক নাটক' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে তিনি আধুনিক বাংলা নাটকের 'অনস্তিত্ব' ও তার কারণও ব্যাখ্যা করেছেন। একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ব্যতিক্রম হিসাবে অভিহিত করেছেন —

"ও দেশে শেকসপীয়ারের পরে দেখা যায় ইবসেন, মেটারলিংক, বার্নাড শ', বেনেভেঁতে ও গলসোয়ার্দিকে—কিন্তু এখানে গিরিশচন্দ্রের পরে, এক রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে, দ্বিতীয় কোনো নাট্যরথীর সন্ধান মেলে না—যাঁর রচনা সম্বন্ধে বলা যেতে পারে—এটা নতুন এক দিকস্তম্ভ।"[১৮]

শিবরাম আধুনিক নাটকে দুটি লক্ষণ অবশ্যক মনে করেন। প্রথমত, নাটকটির নাট্যরূপে বিশিষ্ট নতুনত্ব থাকবে; দ্বিতীয়ত, নাট্যরসে আজকের জীবন সমস্যা উপস্থাপিত হবে। সেই সঙ্গে তিনি মনে করেন একদিকে স্থান- কাল-ঘটনার নিবিড় সঙ্গতি, অন্যদিকে মানুষের সূক্ষ্মতর অনুভূতিতে সাড়া জাগানোই আধুনিক নাটকের মূল লক্ষ্য। এই প্রবন্ধেই তিনি ইংরেজীতে নাটক অর্থে প্রচলিত 'Drama' ও 'Play' শব্দ দুটির অর্থগত পার্থক্য নিরূপণ করেছেন —

"Drama হচ্ছে রঙ্গমঞ্চ-নিরপেক্ষ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে যার রচনা—যার অভিনয়ের যোগ্যতা রঙ্গ মঞ্চকে অর্জন করতে হবে; আর Play হচ্ছে তাই যাকে রঙ্গ মঞ্চে অভিনয়ের যোগ্য করে লেখা হয়েছে।"[১৯]

শিবরাম দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পৌরাণিক নাটক "ভীষ্ম" (১৯১৪), ঐতিহাসিক নাটক "চন্দ্রগুপ্ত" (১৯১১),গিরিশ চন্দ্র ঘোষের "প্রফুল্ল" (১৮৮৯) ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "রমা" (১৯২৮) প্রভৃতি নাটকে আধুনিক নাটকের লক্ষণ-বৈশিষ্ট্যর অভাব তুলে ধরেছেন। সেই সঙ্গে তাঁর মতে —

"এদিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ ও সার্থক রচনা রবীন্দ্রনাথের 'গৃহপ্রবেশ'। একমাত্র এই বইখানিকেই আমরা 'আধুনিক নাটক' বলে অভিহিত করতে পারি।"[২০]

'রঙ্গালয়ে মুখাপেক্ষী হয়ে' কিংবা 'দর্শকের মুখচেয়ে' অথবা 'অভিনয় জমানোর জন্যেই ' আধুনিক বাংলা নাট্যসাহিত্য যেমন কৌলিকতা হারিয়েছে; তেমনি তার মৌলিকতা হারিয়েছে বলে নাট্যসমালোচক

শিবরাম মনে করেন। তাই তাঁর অভিমত তথা অনুসিদ্ধান্ত আধুনিক নাট্যকারকে এই সুলভ যশের সরল পথ বর্জন করে নিজের জন্য নতুন পথ কেটে নিতে হবে। নাট্যরূপের দিক দিয়ে তিনি যেমন আনবেন নতুনকিছু, নাট্যরসের উদ্বোধনের দিকে তেমনি থাকবে তাঁর অপূর্বকিছু।

একটি বিষয় লক্ষণীয়, তাহল একদিকে শিবরাম যেমন নাটক লিখেছেন, অন্যদিকে তেমনি নাটক নিয়ে ভাবনা চিন্তা করে প্রবন্ধও লিখেছেন। তিনি যেভাবে আধুনিক নাটকের স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন তারই অনন্য প্রয়াস লক্ষ করি তাঁর পরের একাঙ্ক নাটক, ''যখন তারা কথা বলবে''তে। নাটকটি 'নবশক্তি' সাপ্তাহিক পত্রিকায় (১ বর্ষ ৪৫ সংখ্যায়) ১৪ মার্চ১৯৩০ সালে প্রকাশিত হয়। শিবরামের কথায় 'নবশক্তি'র পৃষ্ঠাতেই বাংলা সাহিত্যের প্রথম একাঙ্ক নাটক বুদ্ধদেব বসুর ''একটি মেয়ের জন্য'' প্রকাশিত হয়েছিল। তার পরের সপ্তাহে অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্তের ''নতুন তারা'' এবং তার দু - এক সপ্তাহ পরে শিবরামের নিজের 'সম্পূর্ণ' নাটক ''যখন তারা কথা বলবে'' প্রকাশিত হয় । কিন্তু আমরা জানতে পারি যে বুদ্ধদেব বসুর ''একটি মেয়ের জন্য'' ('নবশক্তি', ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৩০) একাঙ্কটির পূর্বেই নাট্যকার মন্মথ রায় রচিত প্রথম একাঙ্ক নাটক "মুক্তি" ১৯২৫ সালে ২৫ ডিসেম্বর স্টার থিয়েটারে অভিনীত হয়।[২১] প্রসঙ্গত আরেকটি বিষয় উল্লেখনীয় তা'হল নবশক্তি পত্রিকায় বুদ্ধদেব বসুর প্রথম প্রকাশিত একাঙ্কটি হল ''ট্রাজেডি'' (২৫ অক্টোবর ১৯২৯)। বলাই বাহুল্য যে মন্মথ রায়ই বাংলা একাঙ্ক নাটকের প্রথম রচয়িতা।

''যখন তারা কথা বলবে'' এই গণচেতনাধর্মী একাঙ্ক নাটকটি প্রকাশের পর জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। মাসিক 'চলন্তিকা' পত্রিকায় আষাঢ় ১৩৫৬ বঙ্গাব্দে অপরিবর্তিত অবস্থায় নাটকটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। নাটকটির প্রথম প্রকাশের সময় পরিচয়সূত্রে 'নবশক্তি' সম্পাদক শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রকারান্তরে নাট্যকার শিবরামের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেছেন —

''নাট্যকার ভারতী কাগজে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দেনাপাওনা' ষোড়শীতে রূপান্তরিত করে তাঁর শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন; তাঁর 'চাকার নিচে' সাহিত্য-রসিকদের প্রীত করেছে এবং বাঙলা নাট্যসাহিত্যে তা হয়েছে এক অভিনব দান। তাঁর এই নাটকখানা যাঁরা পড়বেন তাঁরাই দেখতে পাবেন গঠনের দিক দিয়ে এর যেমন একটা নতুন ভঙ্গি আছে তেমনি খাঁটি নাটকত্ব এতে রয়েছে প্রচুর।''[২২]

নাটকের 'তরুণ লেখক' সোমেশের মধ্যে ''ষোড়শী'' নাট্যরূপকার শিবরাম চক্রবর্তীকে খুঁজে পাওয়া যায়। দুজনের মধ্যে অনেক পার্থক্য সত্ত্বেও বঞ্চনার ইতিবৃত্ত প্রায় একই রকম। উভয়েই তাঁদের লেখার প্রাপ্য স্বীকৃতি ও প্রত্যাশিত অর্থ থেকে বঞ্চিত। কিন্তু অসহায় সোমেশের বঞ্চনার ইতিবৃত্ত কিংবা সিদ্ধার্থ ও মঞ্জরীর প্রেমকাহিনি নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয় হয়ে ওঠেনি। সমাজের নীচুস্তরের সংখ্যাগরিষ্ঠ নিপীড়িত শোষিত শাসিত ব্রাত্য মানুষের মধ্যে গণচেতনা জাগরণই নাটকের উপজীব্য। সাম্যবাদী শিবরাম এই নাটকেও মানুষে-মানুষে

বিভেদপ্রাচীর অবলুপ্তির কথা বলতে চেয়েছেন। তাই সোমেশের মুখে পকেটমারের মরণ শ্রেয় মনে হলেও বেকার যুবক সিদ্ধার্থের কণ্ঠে অন্য কথা ধ্বনিত হয় —

"যেহেতু তারা ছোট লোক? সেই জন্যেই? তাদের মরতে বলতে তুমি পারো—কিন্তু তারা চুপ করে আছে বলে মনে কোরো না যে, বলে নেবার কেবল তোমাদেরই অধিকার। ধরিত্রী তার প্রত্যেক সন্তানের খাদ্য যুগিয়েচে। কিন্তু পেটে যা ধরে তার চেয়ে বেশি কতকগুলো মানুষ ভাঁড়ারে ধরে রেখেচে—তাই অনেককে অর্ধাহারে অনাহারে থাকতে হয়। কিন্তু বাঁচবার অধিকার তাদেরো। এবং চোরাই মাল ফিরে পাওয়া আর যাই হোক চুরি করা নয়। ওদের কণ্ঠ আমরা রুদ্ধ করে রেখেছি। ওরা কিছু বলে না; কিন্তু যেদিন তারা কথা বলবে সেদিন এই কথাই তারা বলবে।"[২৩]

শুধু তাই নয় এক গাঁটকাটা তথা ঐ পকেটমার জিগার মুখেও সাম্যচেতনার কথা জুগিয়েছেন নাট্যকার—তাই তার কল্পিত রাজ্যে —

"আর সবই থাকবে। কেবল থাক্‌বে না বড়লোক, আর পুলিশ। সক্কলকে চাষবাস করে খেতে হবে, কেউ টাকা জমিয়ে কি মুনাফা লুটে আর সব ভাইকে ফাঁকি দিয়ে ঠকিয়ে বড়লোক হতে পারবে না।"[২৪]

প্রখ্যাত সাহিত্যিক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত যথার্থই বলেছেন —

"শিবরামের সত্যিকারের আবির্ভাব হয় তার একাঙ্ক নাটিকায় - 'যেদিন তারা কথা বলবে' আজকালকার গণসাহিত্যের নির্ভুল পূর্বগামী।"[২৫]

নাটকটিতে আরও একটি বিষয় প্রাধান্য পেয়েছে তা'হল দেশপ্রেম তথা স্বাধীনতা আন্দোলন। দেশপ্রেমী বিস্‌মিলের দেশের জন্য বলিষ্ঠ আত্মত্যাগের কথা নাটকটিতে সেই কালে অন্যমাত্রা যোগ করেছিল। বিস্‌মিলের ফাঁসিকাঠে প্রাণ বিসর্জনের কথা জিগার মাধ্যমে উপস্থাপিত করে নাট্যকার বাস্তবতার পরিচয় দিয়েছেন। উর্দু ভাষায় 'কবি' বিসমিল ফাঁসির দড়ি পরানোর আগে গজল গেয়ে উঠল—যার অর্থ জিগার ভাষায় —

"আমি কুর্‌বানির সামনে দাঁড়িয়ে, এখন আমার দিল্ কি চায় তুমি জিজ্ঞাসা করচ! এই জল্লাদ, হায়, যার পায়ের ফাঁসি দূর করতে চাইলুম সে-ই আমার গলায় ফাঁসি পরিয়ে দিচ্চে! যে-হাতে সে আমার ফাঁসি পরাবে আমি তার সেই হাতের—সেই কোতলের বাজুর জোর কত একবার দেখব।"[২৬]

এভাবে স্পষ্ট ভাষায় দেশপ্রেমের কথা একাঙ্ক নাটকে এই প্রথম বলে ড. কৃষ্ণলাল ভট্টাচার্য মনে

করেন। এই একাঙ্কটিকেও তিনি উন্নতমানের একাঙ্ক বলতে নারাজ। পরক্ষণেই তাঁর অভিমত উল্লেখ্য —

"কিন্তু এই দুটি একাঙ্কের কৃতিত্ব অন্যখানে। যখন মন্মথ রায়, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত তাঁদের একাঙ্কগুলিতে স্বাধীনতা আন্দোলনের কথা সযত্নে দূরে সরিয়ে রাখছেন, বনফুল স্বদেশী আন্দোলন সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করছেন ; তখন শিবরাম চক্রবর্তীর দুটি একাঙ্কই দেখি তিনি শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ইংরেজ বিতাড়নের পথকেই মর্যাদা দিয়েছেন।"[২৭]

সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্র শিবরামের নাটক দুটিকে প্রথম আধুনিক হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর অকপট স্বীকারোক্তি —

"বাংলা নাটক যখন ছক-কাটা বাঁধা রাস্তায় ঘুরপাক খাচ্ছে শিবরাম চক্রবর্তী তখন দারুণ দুঃসাহসে সম্পূর্ণ নতুন ভাবনা আর নতুন চালের নাটক লিখে বাংলা নাটকের বদ্ধজলায় বাঁধ-ভাঙা স্রোত বইয়েছিল। শিবরামের তখনকার লেখা নাটকের নাম শুনলেই কান খাড়া করতে হয়। একটির নামছিল, 'চাকার নীচে' আরেকটির 'যখন তারা কথা বলবে'।"[২৮]

"যখন তারা কথা বলবে" নাটকের পরে শিবরাম আর কোনো সিরিয়াস নাটক লেখেননি কিন্তু কতকগুলি নাট্যসংক্রান্ত প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তবে 'গ্রেট থিয়েটার' ও 'উপসংহার' প্রবন্ধ দুটি ব্যতীত অন্যান্য প্রবন্ধগুলির[২৯] মধ্যে শিবরামের নাট্যবোধের চেয়ে "ষোড়শী"র নাট্যরূপকে কেন্দ্র করে ব্যক্তিগত আক্রোশই প্রকাশিত হয়েছে। 'গ্রেট থিয়েটার' (১৯৩০) প্রবন্ধে তাঁর আধুনিক নাট্যভাবনা বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে। সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'লিটল থিয়েটার' (দীপালি, শারদীয় ১৯৩০)-এর জবাবে গ্রেট থিয়েটার প্রবন্ধটি লিখেছিলেন। তাঁর দৃষ্টিতে থিয়েটার 'লিটল' নয় 'গ্রেট'। সকলের জন্য অবারিত, প্রবেশ মূল্য চারআনা থেকে একটাকা (সামনের আসনের জন্য দুটাকাও করা যেতে পারে) থেকে শুরু করে নাটকের সময়, থিয়েটারে অভিনয় প্রদর্শন ইত্যাদি অনেক বিষয়ই তিনি আলোচনা করেছেন। যেমন, 'নাটক হবে ছোট, দুঘন্টার মতো - এবং দুটো একটি মাত্র দৃশ্যে সম্পূর্ণ হবে। তবে পাত্রপাত্রী হবে কম, এজন্য বেশি অভিনেতা অভিনেত্রীর দরকার হবে না। দৃশ্যপটের বালাই বেশি থাকবে না। খাঁটি অপেরাও চলতে পারে, কিন্তু তাও দু'ঘন্টা মতো হওয়া চাই।'

কিংবা —

'অভিনয়ের জন্য থিয়েটারের যে Night কিনে নেওয়া হবে, সে রাত্রে ৫টা থেকে ৭টা ও ৮টা থেকে ১০টা দুবার অভিনয়ের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এই দু'বারের আয়ে যে টাকা উঠবে তার থেকে প্রোডাকশনের

খরচা খরচ বাদে যা থাকবে, তা নাট্যকারের ও শিল্পীদের মধ্যে বেঁটে দেওয়া হবে।'

আবার 'উপসংহার' প্রবন্ধে আধুনিক নাট্যকারের প্রসঙ্গে তাঁর অভিমত স্মরণীয়। তাঁর মতে নাট্যরূপ, নাট্যরস ও নাটকত্বের ধারণা প্রতি যুগেই বদলে যাচ্ছে, পঞ্চাশ বছর আগের নাটক বলতে যা বোঝাত আজ তা বোঝায় না। যে নাট্যাধ্যক্ষ রঙ্গমঞ্চে সত্যিই নবযুগ আনতে চান, এবং নিজেকে নাট্যবোধসম্পন্ন বলে পরিচিত করবার প্রয়াসী, তাকে নাট্য প্রগতির সঙ্গে সমানতালে পা ফেলতে হবে। আধুনিক নাটক অভিনয় করে তিনি আধুনিক নাট্যকারকে অনুগ্রহ করেন না, আধুনিক নাটক তিনি অভিনয় করতে বাধ্য। এসব নাট্যসংক্রান্ত ভাবনা চিন্তা থেকে সহজে বোঝা যায় নাট্যকার শিবরাম কত সিরিয়াস একজন নাট্যবিদ ছিলেন।

শিবরাম সিরিয়াস নাটক না লিখলেও কতকগুলি হাস্যরসাত্মক একাঙ্ক নাটক লিখেছিলেন। এই রকমের হাস্যরসাত্মক ১৩টি নাটকের সংকলন ''শিবরাম চক্রবর্তীর শিশুনাট্য'' নামে ১৯৬৬ সালে প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে 'বাজার করার হাজার ঠ্যালা' (১৯৪০), 'প্রাণকেষ্টর কাণ্ড (১৯৫৪), 'পণ্ডিত বিদায়' (১৯৫৫) , 'মামা ভাগ্নে' (১৯৫৮) প্রভৃতি নাটক পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছিল। এই সংকলনের বাইরেও 'প্রাণকেষ্টর কীর্তি' (১৯৫৮), 'ঘটাদার ঘনঘটা' প্রভৃতিনাটক রয়েছে। এছাড়াও ছোটদের মাসিক পত্রিকা 'রোশনাই' - এর সম্পাদিকা শ্রীমতি গীতা দাস শিবরামের 'প্রাণকেষ্টর দুই কাণ্ড' -এর দ্বিতীয় গল্প তথা 'আত্মীয় সংকট' -এর নাট্যরূপ দিয়েছিলেন। 'প্রাণকেষ্টর প্রাণান্ত' নাট্যরূপটি শিবরামের জীবিত কালেই প্রকাশিত হয়।

বিষয় বৈচিত্র্যে ও উপস্থাপনা কৌশলে নাটিকাগুলি হাস্যরসাত্মক গল্পগুলির মতই উপাদেয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'হাস্যকৌতুক' ও 'ব্যঙ্গকৌতুক'-এর ঢঙে লেখা একাঙ্ক গুলিতে রসসাহিত্যিক শিবরাম চক্রবর্তীকে যেমন চেনা যায়, তেমনই একজন সার্থক নাট্যকার হিসাবে পরিচয়ও সহজলভ্য ওঠে। সমালোচক বারিদবরণ ঘোষ জানিয়েছেন —

''যদি সূক্ষ্ম ভাবে বিচার করা যায় তবে দেখা যাবে, বাংলা সাহিত্যে একাঙ্ক নাটকের সূত্রপাত হয়তো তাঁরই হাতে। একই কালে বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্ররাও একাঙ্ক নাটক লিখতে শুরু করেন, মন্মথ রায়ও।''[৩০]

শিশুনাট্য সংকলনের অধিকাংশই শিবরামের জনপ্রিয় হাসির গল্পের নাট্যরূপ। যেমন 'পণ্ডিত বিদায়', 'বাজার করার হাজার ঠ্যালা', 'বেতন নিবারক বিছানা', 'তোতলামির সারানোর ইস্কুল', 'একটি স্বর্ণঘটিত অপকীর্তি', 'রোমান্স!', 'সম্পাদকের বিপদ', 'প্রেম বিচিত্র বস্তু' প্রভৃতি একাঙ্কের মূল কাহিনি 'পণ্ডিত বিদায়', 'হলধর আর ইন্দ্রসেন','মন্টুর মাস্টার', 'পরোপকারের বিপদ', 'অথ স্বর্ণঘটিত', 'অবাঞ্ছনীয় উপসংহার', 'আমার সম্পাদক শিকার' এবং 'প্রেমের বি-চিত্র গতি' প্রভৃতি গল্পথেকে নেওয়া হয়েছে। যদিও সংকলনের শেষ তিনটি নাটক যথা 'দেবা ন জানন্তি', 'প্রেম বিচিত্র বস্তু' এবং 'উদ্বাস্তবিক' সম্পর্কে সূচিপত্রে লেখা হয়েছে ''নেহাৎ ছোটদের জন্য নয়''।

এছাড়াও আরও কয়েকটি একাঙ্কিকা ছোটোদের উপযোগী নয় বলে মনে হয়। এগুলি হল 'তোতলামি সারানোর ইস্কুল', 'রোমান্স!' এবং 'সম্পাদকের বিপদ'। বাকি নাটিকাগুলির মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ই নির্মল হাস্যরস সৃষ্টি। যেমন 'পণ্ডিত বিদায়' নাটকটি। এটি 'পণ্ডিত বিদায়' গল্পের আংশিক পরিবর্তন করে নাট্যরূপ দিয়েছেন শিবরাম। সংস্কৃতের পণ্ডিতমশাইকে ক্লাসের দুষ্টু ছাত্র পদ্মলোচন জব্দ করার অভিলাষে 'স্টেটসম্যান', 'বঙ্গবাসী', 'এডুকেশন গেজেট', 'সাপ্তাহিক বার্তাবহ', 'ফ্রেণ্ড অব ইন্ডিয়া' পত্রিকাগুলি উল্টোদিক থেকেসাজিয়ে একটি অদ্ভুত শ্লোক তৈরী করে —

হবার্তবা কহিপ্তাসা টজেগেন শকেডুয়ে
আণ্ডীব অণ্ডফ্রয়েন মানস্টেট শিবাঙ্গব।

স্বভাবতই পণ্ডিতমশাই পদ্মলোচনের শ্লোকের অর্থ করতে পারেন না। অনেক চেষ্টা চরিত্র করেও ব্যর্থ হয়ে বিদ্যালয় ছেড়ে অন্তর্হিত হন তিনি। কিন্তু নাটকটি শিবরাম অন্যভাবে শেষ করেছেন। পণ্ডিতমশাই ভয়ে স্কুলে না আসায় বিদ্যালয় পরিদর্শক তার ৩০ টাকা জরিমানা করেন। অবশেষে পণ্ডিতমশাই ছেলেদের না-মারার ও ভালো করে পড়ানোর প্রতিশ্রুতি দেন এবং ছেলেরাও মাপ চেয়ে নেয়। এমনকি পণ্ডিতমশায়ের মাইনে ডবল করে দেন বিদ্যালয় পরিদর্শক। ফলে নাটকটির শেষ মুহূর্তে একমুঠো মুক্ত হাওয়ার মতো তৃপ্তিবোধ জেগে ওঠে দর্শকদের মধ্যে। মঞ্চসফল নাটকটি হেয়ার স্কুল ও ব্রাহ্ম গার্লস স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছিল। পানাসক্ত শিবরাম শব্দের খেলায় ও বিদ্বেষহীন রসিকতায় হাস্যরসের নাটকগুলিতে হাসির প্রাণবন্ত উৎসের সন্ধান দিয়েছেন।

কতকগুলি নাটক শিশুনাট্য সংকলনে স্থান পেলেও সূচিপত্রে যেমন নির্দেশিত হয়েছে তেমনই আরও তিনটি যোগ করা যেতে পারে যেকথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এই নাটকগুলিতে শিবরাম রসিকতার ছলে অনেক বিষয়ের মর্মমূলে আঘাত করেছেন। আরও একটি বিষয় হলো এই নাটকগুলির কোনোটি যেমন 'রোমান্স!', 'দেবা ন জানন্তি', 'প্রেম বিচিত্র বস্তু' প্রভৃতির উপাস্থাপনে ছোটোদের অনুপযোগী কথাবার্তা প্রকাশিত হয়েছে। 'রোমান্স !' নাটকে দেখা যায় —

ত্রিদিব। এসব ছবি তোমাদের দেখবার মতো নয় শ্রীলা! হলে কি আমি আর নিয়ে যেতুম না ? টার্জানের কি লরেল-হার্ডির ছবি হলে তো —

শ্রীলা । আমার কেলাসের সব মেয়েই তো অ্যাডাল্ট্স-ওনলি ছবি দ্যাখে —

কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে শ্রীলার স্বগতোক্তিতে আধুনিক শহরের ভোগবাদী মধ্যবিত্তদের কৃত্রিমজীবনের

অসঙ্গতি ফুটে ওঠে —

আমাকে নিয়ে যাওয়া হোল না সিনেমায়। নিজেরা মজা করে রেস্তরাঁয় খাবেন, ছবি দেখবেন— আমি যেন আর কিছু বুঝতে পারিনে। ছেলেমানুষির ছুতো দেখিয়ে আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হলো না। বেশ! কেবল আমার বেলাতেই যতো —!

(জানালার কাছে গিয়ে)

ঐ যে যাওয়া হচ্ছে হেলতে দুলতে। পাশাপাশি—একেবারে ঘেঁষাঘেঁষি। এই—এ যদি রোমান্স না হয়, তবে রোমান্স কাকে বলে শুনি একবার? ..... আচ্ছা, ঐ ভদ্রলোকটি কে? রোজ এই সময়ে ওভারকোট গায়ে এই রাস্তা দিয়ে বেড়াতে যান। কী রকম লম্বা চওড়া—আর কী চমৎকার না দেখতে! কোথায় থাকেন উনি? মনে হচ্ছে এই রাস্তার কোণের ঐ গলির মধ্যেকার হলদে বাড়িটাতেই। পাশের বাড়ির বাঁশরীর কাছে খবর নিতে হবে। ওর সঙ্গে কেউ আমায় আলাপ করিয়ে দেয় না?

(শ্রীলা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললো)

কেন, আমি নিজেই তো আলাপ করতে পারি। গায়ে পড়ে আলাপ করলে মান যায় নাকি! কেন, পারিনে আমি? অচেনা যুবকের সঙ্গে মিশতে নেই কি মেয়েদের? ..... না মিশলে পরে চেনা হবে কি করে? চেনাচিনি না হলে তো বিশ্বসুদ্ধ সবাই অচেনা থেকে যাবে সবাইকার ..... চিরটাকাল! দাঁড়াও, করছি আমি এখুনি আলাপ—এই তো, আমাদের বাড়ির তলা দিয়েই যাচ্ছেন তো এখন — (তারস্বরে) হেল্‌প্! হেল্‌প্!! খুন—জখম—রাহাজানি। কে কোথায় আছো রক্ষা করো! ..... বাঁচাও আমায় ! রক্ষে করো ! রক্ষে করো!!

(তারপরে নিজের পরনের শাড়িটা অবিন্যস্ত করে ব্লাউজের খানিকটা ছিঁড়লো আর চুলগুলো এলোমেলো করে দিলো)

এবার? এবার কী? রোমান্টিক বই দেখতে নেই আমাদের? এখন? এখন যে আমি ঘরে বসে রোমান্স করছি—চাইকি, ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে একটা সিনেমা দেখতেও যেতে পারি আজ—যদি তেমনধারা আলাপ জমে ..... জমাতে পারি যদি —

(নেপথ্যে পদশব্দ পেয়ে অসহায়ের মত এলিয়ে পড়লো শোফায়)

সাহায্যে আগত যুবকের সঙ্গে শ্রীলার আদিরসাত্মক ইঙ্গিতের মাঝে পাশের বাড়ির ভদ্রলোকের ফোন পেয়ে লালবাজারের দারোগা তার সহকর্মী নিয়ে চলে আসেন। হাতেনাতে ধরা পড়েছে ভেবে দারোগার আদেশে অধস্তন পুলিশকর্মী হাতকড়া পড়াতে গিয়ে আবিষ্কার করে যুবকের কথাই সত্য—তার কোন কিছুতেই হাত নেই। কারণ তার দুটি হাতই কাঁধ থেকে কাটা। এভাবে নাট্যকার ঘটনার উপস্থাপনে ও শব্দের খেলায়

হাস্যরসের সৃষ্টি করেছেন, তেমনই আধুনিক রোমান্সকে উপহাস্য করে দেখিয়েছেন। আর একটি বিষয় লক্ষণীয় তা'হল শিবরাম এই একাঙ্কিকায় শ্রীলার সংলাপ ও আচরণে আধুনিক নারী-সচেতনতা এবং নারীর স্বচ্ছন্দ গতির বিষয়টিকে উপস্থাপিত করেছেন। এভাবে নরনারীর প্রেমকে কেন্দ্র করে আবর্তিত দুটি নাটিকা 'দেবা ন জানন্তি' ও 'প্রেম বিচিত্র বস্তু' -এর মধ্যে হাস্যরসের সঙ্গে প্রথমটিতে প্রেমের রহস্যময়তা ও দ্বিতীয়টিতে প্রেমের অসারতাকে শিবরাম রঙ্গ-পরিহাস করেছেন।

শিবরামের একটি অসাধারণ নাট্যপ্রয়াস 'তোতলামি সারানোর ইস্কুল'। পরোপকার করার সদিচ্ছা থাকলেই যে করা যায় না, বিশেষ করে সাধ্যাতীত প্রচেষ্টা যদি হয়, তারই নিটোল নাট্যরূপায়ণ এই নাটকটি। স্বঘোষিত পরোপকারী নিরঞ্জন নিজে বিয়েও করেননি। পিছনে নিজের উপকার করে বসে এই ভয়ে। তোতলাদের জন্য সে একটি বিদ্যালয় খুলতে চায়। তার ইচ্ছে ''আমিও স্থির করেছি বাংলাদেশের তোতলাদের সব ডিমস্থিনিস বানাবো।'' ডিমস্থিনিস বানাবার কারণও বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। নিরঞ্জন জানিয়েছে তোতলা ডিমস্থিনিস পৃথিবীর অপূর্ব 'বড়ো বক্তা' হয়েছিলেন। তাই বক্তা বানাবার জন্যই তোতলাদের ইস্কুল সে খুলতে চায়। কারণ তার মতে —

''বক্তার অভাবেই তো দেশটা মাটি হচ্ছে। দেশের এত দুর্গতি। লোককে কাজে প্রেরণা দিতে তো বলতে হবে, বলে বোঝাতে হবে। বক্তা চাই আগে, শত সহস্র বক্তা চাই, তা না হলে এই ঘুমন্ত দেশ জাগবে কি করে?''

এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, শিবরাম সভা সমিতিতে বক্তব্য শুনতে এবং শোনাতে উভয়েই অস্বস্তিবোধ করতেন।

বিদ্যালয়ের নামকরণ প্রসঙ্গে বন্ধু হিরণ্ময়ের প্রস্তাবিত নাম নিস্বভারতী নিরঞ্জন মেনে নিতে পারেনি — কারণ ''বিশ্বভারতী ভাববে তাদের দেখে তাদের থেকেই নামটা চুরি করেছি। তারা আপত্তি করতে পারে।'' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে প্রথমদিকে শিবরাম বিরূপ সমালোচনা করেছিলেন। নাটকের পরিশেষে লক্ষ করা যায়, তোতলামি সারাতে ব্যর্থ হয়ে নিরঞ্জনেরা নিজেরাই তোতলায় পরিণত হতে চলেছে। এভাবে নাট্যকার শিবরাম তথাকথিত জনদরদি পরোপকারী দেশহিতৈষী ভাবুকদের হাস্যরসের মোড়কে সমালোচনা করেছেন।

এভাবে হাস্যরসের মোড়কে সাহিত্যজ্ঞানরহিত নামাকাঙ্ক্ষী নতুন লেখকদের মুখোশ খুলেছেন 'সম্পাদকের বিপদ' -এ এবং উদ্বাস্তু সমস্যা তুলে ধরেছেন 'উদ্বাস্তবিক' একাঙ্কিকায়।

নাট্যকার শিবরাম নাট্যজীবনের প্রথমদিকে যে ভাবে গণচেতনাধর্মী নাটকে মনোনিবেশ করেছিলেন পরবর্তী সময়ে শুধুমাত্র হাস্যরসাত্মক নাটকই লেখেননি, রসিকতার মোড়কে অনেক গুরুগম্ভীর বিষয়কেও লঘুরসের ভিয়ানে চড়িয়ে তা উপস্থাপনাও করেছেন রসিক পাঠকের দরবারে।

ঘ) গল্পকার শিবরাম

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে হাসির গল্পকার হিসাবেই গল্পকার শিবরাম চক্রবর্তীর পরিচিতি। অথচ হাসির গল্প লেখার পূর্বে তিনি ভিন্ন স্বাদের গল্প যেমন লিখেছিলেন, তেমনই হাসির গল্পের পাশাপাশি হাস্যরসের মোড়কে সিরিয়াস বিষয়েও গল্প লিখেছেন। 'দেবতার জন্ম', 'কালান্তক লালফিতা'র মতো গুটিকতক গল্প পাঠকের সমাদর পেলেও শিবরামের অনেক সিরিয়াস গল্প হাসির গল্পের জনপ্রিয়তার নিরিখে আলোচনার বাইরে রয়ে গিয়েছে। ফলে গল্পকার শিবরাম চক্রবর্তীর যথার্থ পরিচয় তথা মূল্যায়ন আজও হয়নি বললেই চলে। শুধু তাই নয়,গল্পের আঙ্গিক-প্রকৃতি বিষয়ে শিবরামের উপযোগী ভাবনাচিন্তার স্বরূপও আলোচনার দাবি রাখে।

শিবরামের সাহিত্যজীবন কবিতা দিয়ে আরম্ভ হলেও সেই সঙ্গে তিনি গল্পও লিখেছিলেন বলে জানিয়েছেন। একদিকে রুশ বিপ্লবোত্তর বাংলাসাহিত্য,অন্যদিকে কল্লোলীয় অভিনব ভাবনার পরিমণ্ডলে শিবরাম ছোটোগল্প রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। সমাজের অবহেলিত নিপীড়িত মানুষের কথা যাঁরা বলতে চেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে শিবরামও ছিলেন অগ্রগণ্য। 'কল্লোলযুগের ছোটগল্প ও রুশ বিপ্লব' শীর্ষক গ্রন্থে ড. শিবশংকর বল বলেছেন —

"কী লিখছেন তাঁরা? যাদের কথা এতদিন কেউ লেখেননি সেই নীচের তলার মানুষের জীবনযন্ত্রণা। তাদের বেঁকে চুরে যাওয়া হতমান কুশ্রী জীবনের শতচ্ছিন্ন আশা - হতাশার কামনা-বাসনার উগ্র লীলাকে শিল্পিত করতে চাইছেন তাঁরা।"[১]

শিবরাম 'তাঁদেরই' একজন। আরেকজন সমালোচক বিষয়টিকে অন্যভাবে দেখেছেন। তাঁর কথায়—

"আসলে যে ভাবের অসঙ্গতি থেকে 'কল্লোলে' তরুণেরা সমবেত হন, তা রবীন্দ্রভাবনার বিরোধিতার নামে নতুন কথা বলার এক যৌবনদৃপ্ত ভঙ্গি।"[২]

শিবরাম 'কল্লোল' পত্রিকায় মাত্র একটি গল্প লিখেছেন 'আরেক ফাল্গুনে' (৩ সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩৩১। "কিন্তু তাতে, কিংবা ঐ সময়কার আর কোনো গল্পেও হাসির ছিটে ফোঁটাও ছিলনা কোথাও।"[৩]

অকল্লোলীয় হয়েও শিবরামকে কল্লোলীয় বলে মনে করেন কল্লোলগোষ্ঠীর অন্যতম সাহিত্যিক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। কারণ "মনোভঙ্গির দিক থেকে শিবরাম তো বিশেষ সমগোত্র।"[৪]

কল্লোল ব্যতীত সমসাময়িক কালে 'ভারতী' ও সচিত্র 'শিশির' পত্রিকায় শিবরামের 'শিশুর প্রেম', 'দুটি ছেলের রোমান্স', 'পথবালক' ও 'গোপন ব্যথা' প্রভৃতি গল্প প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম তিনটি গল্পে শিবরাম সমকামী সম্পর্কের মাধুর্য আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছেন। গল্পগুলিতে শিব্রামীয় রঙ্গ কৌতুক না থাকলেও বিশিষ্টতা রয়েছে বিষয়বস্তুতে। সমকামিতার মত অভিনব বিষয় নিয়ে তিনি শুধু গল্পই লেখেননি, উপন্যাসও লিখেছিলেন। তাঁর "ছেলে বয়সে" (১৯২৫) উপন্যাসটি তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

একটি বিষয় এখানে লক্ষণীয় তা'হল শিবরাম হাসির গল্প লেখার পূর্বে সিরিয়াস বিষয়ে গল্পরচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন। 'বড় পত্রিকার পৃষ্ঠায় বয়স্কদের পাতে পরিবেষিত' 'ইয়াব বড়বড় গল্প' তিনি লিখেছিলেন 'সৃষ্টি সুখের উল্লাসে'। কিন্তু সে সময়ে বাংলা সাহিত্যের প্রায় সব শাখাতেই বিচরণ করতে গিয়ে গল্প লেখায় বেশি করে মনোযোগ দিতে পারেননি কিংবা দেননি। তাই প্রথমদিকে গল্পকার শিবরাম তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো জনপ্রিয়তা পাননি। অবশ্য 'ভারতী' পত্রিকায় গল্প লিখে তিনি 'অস্বাভাবিক খ্যাতি' অর্জন করেছিলেন বলে জানা যায়। কিন্তু শিবরামের সমসাময়িক সাহিত্যিক হেমেন্দ্র কুমার রায়ের মন্তব্যে গল্পকার শিবরামকে স্বীকৃতি দানের অনীহা দেখা যায় —

"আগেকার শিবরাম ঘুরে বেড়াতেন সাহিত্য-জগতের নানা পথে কখনো সংবাদিক কখনো ঔপন্যাসিক, কখনো নাট্যকার, কখনো প্রবন্ধকার এবং কখনো বা কবিরূপ ধারণ করে।"[৫]

গল্পকার হিসাবে শিবরামের জনপ্রিয়তার সূচনা হয় 'মৌচাক' পত্রিকার মাধ্যমে। এই পত্রিকায় তাঁর প্রথম ছোটোদের গল্প 'পঞ্চাননের অশ্বমেধ' প্রকাশিত হয়। এই গল্পের জন্য আগাম দক্ষিণাবাবদ পনের টাকা নগদ পেয়ে শিবরাম বিস্মিত ও উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর অভিব্যক্তি —

"অ্যাতো লিখেও একটা পয়সা পাইনি, আর এই না-লিখেই টাকা পেতে সেই যে আমার হাসি পেলো, সেই হাসিই প্রকাশ পেলো আমার প্রথম ছোটদের লেখায়। তারপর সেই হাসিটি ছড়িয়ে গেলো আমার আরো-আরো গল্পে। শুরু থেকে এখন পর্যন্ত আমার সেই হাসিরই সুর।"[৬]

পূর্বের সিরিয়াস গল্পকার শিবরাম হাসির গল্পকার শিবরামের জনপ্রিয়তায় চাপা পড়ে যায়। তাইতো 'মৌচাকে'র সম্পাদক সুধীরচন্দ্র সরকার অজান্তেই লিখেছেন ''তাঁর প্রথম গল্প 'পঞ্চাননের অশ্বমেধ' মৌচাকে প্রকাশিত হয়। পরে ঐ নামেই আমরা একটি পুস্তক প্রকাশ করি।''[৭] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য 'পঞ্চাননের অশ্বমেধ' শিবরামের প্রথম ছোটোদের গল্প, প্রথম গল্প নয়। বলাই বাহুল্য হবে, শিবরাম 'পঞ্চাননের অশ্বমেধ' রচনার পূর্বেও একাধিক গল্প লিখেছিলেন।

ছোটোদের পাশাপাশি বড়দের জন্যও গল্প লিখেছিলেন সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্রের সহযোগিতায়। এ বিষয়ে শিবরাম জানিয়েছেন —

''প্রেমেনের কাছে তালিম নিয়ে বড়দের গল্পে আমার সবে তখন হাতেখড়ি। লিখেছি মোটে গুটি তিনেক, 'দেবতার জন্ম' আর লালির কাহিনী নিয়ে 'ঘাত প্রতিঘাত', আরেকটি আমার এক কাজিনের বিয়ের কান্ড নিয়ে 'প্রজাপতির পক্ষপাত'। প্রথম গল্পদুটি কবি শৈলেন লাহার গল্প পত্রিকার বেরুলো। তৃতীয়টি কোথায় বেরিয়েছিল মনে পড়ে না।''[৮]

প্রত্যুত্তরে প্রেমেন্দ্র মিত্র সবিনয়ে বলেছেন —

''কথাটা যে আমার প্রতি তার পক্ষপাতের আতিশয্য, তার যে কোনো লেখাই তার প্রমাণ।

মাছকে কি সাঁতার শেখাতে হয়?

কিছু যদি আমি করে থাকি তাহলে তাকে জলে ঠেলে দিয়েছি মাত্র।''[৯]

অবশ্য 'দেবতার জন্ম' নামক অসাধারণ গল্পটি যে তাঁরই প্রদত্ত সূত্র ধরে শিবরাম লিখেছিলেন সেকথা নিজেই জানিয়েছেন। সেই গল্পকার শিবরামের ভূয়সী প্রশংসা করে তাঁর শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়ে প্রেমেন্দ্র মিত্র জানিয়েছেন —

''অথচ এই শিবরামই পরে দেখেছি সামান্য একটা খড়কুটো পেলে একটা বড় বাগান বানিয়ে দিতে পারতো অনায়াসে।''[১০]

যাই হোক শিবরামের প্রথম বড়দের গল্পের বই ''প্রজাপতির পক্ষপাত'' নামে কমলা পাবলিশিং থেকে প্রকাশিত হয়।এভাবে ১৯৩৫ সাল থেকে ছোটো-বড় সকলের জন্য হাসির গল্প লেখায় শিবরাম নিজেকে

নিয়োজিত করেছিলেন। একদিকে যেমন মৌলিক গল্প লিখেছেন, অন্যদিকে তেমনি বিদেশী সরস গল্পের স্বচ্ছন্দ অনুবাদ করেছেন। এছাড়াও বিদেশী গল্পাদির ছায়া অবলম্বনেও গল্প রচনা করেছেন।

এইভাবে শিবরাম হাসির গল্পের ধারায় এমন ভাবে মনোনিবেশ করেছিলেন যে তাঁর পূর্ববর্তী গণচেতনাধর্মী তথা সিরিয়াস সাহিত্য রচনার দিকে ফিরে তাকানোর অবকাশ পাননি কিংবা বলা ভালো সদিচ্ছাও পোষণ করেননি। লিখেছিলেন অজস্র ছোটো বা বড়দের জন্য হাসির গল্প। ১৯৩৫ থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত মাত্র ছয় বছরে শিবরামের মৌলিক গল্প গ্রন্থই প্রকাশিত হয়েছে পনেরটির মতো। যথা ''পঞ্চাননের অশ্বমেধ'' (১৯৩৫), ''শুঁড়ওলা বাবা'' (১৯৩৫) ''কলকাতার হালচাল'' (১৯৩৬), ''কাকাবাবুর কাণ্ড'' (১৯৩৭), ''কালান্তক লালফিতা'' (১৯৩৭), ''মন্টুর মাস্টার'' (১৯৩৭), ''মালাই বরফ'' (১৯৩৮), ''যুদ্ধে গেলেন হর্ষবর্ধন'' (১৯৩৮) ''বিশ্বপতিবাবুর অশ্বত্ব প্রাপ্তি'' (১৯৩৯), ''মামার জন্মদিন'' (১৯৩৯),'' হর্ষবর্ধন অপহরণ'' (১৯৩৯)''হর্ষবর্ধনের হর্ষধ্বনি'' (১৯৩৯), ''কেবল হাসির গল্প'' (১৯৪০) ''ফুটবলের দৌড়'' (১৯৪০) এবং ''মধুরেণ সমাপয়েৎ'' (১৯৪০)। এছাড়াও রয়েছে স্বচ্ছন্দ অনুবাদিত গল্পগ্রন্থ ''টমসয়্যারেরগল্প''(১৯৩৯),''এক রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চার'' (১৯৪০)। আবার ১৯৪১ থেকে ১৯৪৫ সালে পর্যন্ত মাত্র পাঁচ বছরে নয়টির মতো গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। যথা ''আমার ভূতদেখা'' (১৯৪১), ''বাবুম বুবুম বুম'' (১৯৪১), ''মেয়েদের মন'' (১৯৪১),'' ভারী বিপর্যয় ব্যাপার'' (১৯৪২), ''প্রেমের বি-চিত্র গতি'' (১৯৪২), ''মানুষের উপকার করো'' (১৯৪৩), ''বর্মার মামা'' (১৯৪৪), ''মৃত্যুর মুখোমুখি'' (১৯৪৪) ও ''শিব্রাম চকরবরতির মতো কথা বলার বিপদ'' (১৯৪৫)। এভাবে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত প্রায় প্রতিবছরেই শিবরামের একাধিক গল্প গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৪৫ সালের ৩০ জুন বেতারে 'আমার গল্প লেখা' পর্যায়ে শিবরাম চক্রবর্তী তাঁর গল্প লেখার কথা বলেছেন। তাতে একটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে যায় তা'হল তাঁর সব হাসির গল্পই উদ্ভট বা কষ্টকল্পিত নয়। তাঁর কথায় —

''কিন্তু আমি জানি, আমার প্রায় সব গল্পই সত্য ঘটনা, এই জীবনে, হয়ত এই অধমকে নিয়েই দুর্ঘটিত, এবং তার কোনটাই গাঁজা নয়, হয়ত বা কোথাও একটু অত্যুক্তি থাকতে পারে, কিন্তু তাহলেও তা আমার এই জীবন থেকে গাঁজানো।''[১১]

হাসির গল্পের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ''বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসের ধারায় শিবরাম চক্রবর্তী'' নামক অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে গল্পকার শিবরামের শিল্পীসত্তার পরিচয় প্রদানে প্রয়াসী হয়েছি।

শিবরাম চক্রবর্তী বাংলা গল্পের একজন সচেতন শিল্পী। তার পরিচয় শুধু তাঁর গল্পেই মেলে না, প্রবন্ধেও সমুজ্জ্বল। 'হাসির গল্প হাসিল করা' এবং 'হাসির গল্পের আঙ্গিক' প্রবন্ধ দুটি ব্যতীত বিভিন্ন গল্পগ্রন্থের ভূমিকায়ও তার পরিচয় সুস্পষ্ট। আত্মজীবনীতেও তাঁর সাহিত্য সম্পর্কে অভিনব ভাবনা চিন্তা প্রকাশিত

হয়েছে। শিবরাম 'সত্যিকারের সাহিত্যিক'দের 'সাহিত্য সাধনায়' একদিকে 'রূপশিল্প', অন্যদিকে 'শিল্পরূপে'র কথা বলেছেন। তাঁর ভাষায় —

"একের লক্ষ্য কী বলব; আরেকের কেমন করে বলব; একজনের কলা বজায় রেখে বলা, অপরের বলাটাই হচ্ছে কলা।"[১২]

শিবরামের ছোটোগল্পে রূপশিল্প ও শিল্পরূপের অপূর্ব সমন্বয় লক্ষ করা যায়। তাঁর গল্পের বিষয় ও আঙ্গিকের অভিনবত্বে একজন সার্থক গল্পকারেরই প্রতিচ্ছবি প্রতীয়মান হয়।

গল্পকার শিবরাম বলতে সাধারণভাবে হাসির গল্পকার বলেই মনে হবে প্রথমে। অথচ হাসির গল্প নিয়ে তাঁর চিন্তা-ভাবনা সবিশেষ অভিনব। হাসির গল্পের বিষয় সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত অভিমত উল্লেখনীয়। তাঁর কথায় —

"হাসির গল্পও অমূলক। তার মূল কোথায় কেউ জানে না। লোকের মুখে মুখে ঘুরে বেড়ায়— হাসির মতই। ঘুরতে ঘুরতে পল্লবিত হয়—আরো আরো মজাদার হয়ে ওঠে। তারপর কেউ হয়ত তাকে পাকড়ে নিয়ে নিজের লেখায় হাসিল করে।"[১৩]

অন্যত্র তিনি জানিয়েছেন —

" হাসির গল্পের গোত্র আলাদা। তার প্রকাশভঙ্গী অন্যরকম। হাসির গল্প-লিখিয়েও জীবনকে দ্যাখে, জীবন থেকেও নিজের লেখার উপাদান নেয়, কিন্তু তার জীবনদর্শন ঠিক সোজাসুজি নয় তির্যক। ..... গভীর অশ্রুর সমুদ্র থেকে তার হাস্যোচ্ছ্বাস উদ্বেল হয়ে উঠতে পারে কিন্তু সেই অশ্রুত পূর্ব কীর্তি যখন কাহিনীর বেলাভূমিতে গড়িয়ে যায় তখন তা হাসিরই ঢেউ।"[১৪]

হাসির গল্পের আঙ্গিক নিয়ে শিবরামের অভিমত একজন সিরিয়াস গল্প লেখকেরই সামিল। তাঁর কথায় —

"আঙ্গিক স্বভাবতই জীবনাঙ্গিক। জীবনকে অঙ্গীকার করেই। হাসির গল্প লিখিয়েকেও জীবন থেকেই তার লেখার উপাদান যোগাড় করতে হয়। অবশ্যি, বাছবিচার করেই—কিন্তু তাহলেও তাকে জীবনকে দেখতে হয়, দেখাতে হয় জীবনকেই।"[১৫]

হাসির গল্প বলে উপস্থাপিত রচনাটা যেন হাস্যকর না হয়ে ওঠে সে বিষয়ে তিনি সচেতন করে বলেছেন —

"হাসির গল্প হাসির তো হবেই, কিন্তু তার গল্পও হওয়া চাই আবার। গল্পকারের মৌলিক দায়ের উপর হাসিটা উপরি আদায়। কিন্তু খালি হাসিয়েই কি লেখকের খালাস আছে? তাকে দেখতে হয় যে হাসির হলেও লেখাটা যেন হাস্যকর না হয়। গল্পের আঙ্গিক ইঙ্গিতে কোনো খুঁৎ থাকলে চলে না। লেখার কোনোখানে ফাঁকি থাকবে না, ফাঁক তালে মজা থাকবে।"[১৬]

'পোলাপানাসক্ত' শিবরাম অভিনব বিষয়-আঙ্গিকের সহাবস্থান ঘটিয়েছেন তাঁর অধিকাংশ হাসির গল্পে। যেমন ছোটোদের, তেমনই বড়দের গল্পে। মূলত শিক্ষাব্যবস্থা (যেমন 'ইংরিজি যার নাম', 'শিক্ষাদান', 'পরোপকারের বিপদ' প্রভৃতি), বিচিত্র বিষয় (যেমন 'অঙ্ক ও সাহিত্যের যোগবলে', 'প্রকৃতি-রসিকের রসিক প্রকৃতি', 'একলব্যের মুণ্ডুপাত', 'শুঁড়-ওলা বাবা' প্রভৃতি), বিচিত্র চরিত্র (যেমন হর্ষবর্ধন, গোবর্ধন, মন্টু, কঙ্কেকাশি, নিকুঞ্জ, প্রিসিলা, ইতু বিনি, জবা এবং স্বয়ং শিব্রাম প্রভৃতি), বিচিত্র অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি (যেমন 'শ্রীকান্তের ভ্রমণকাহিনী', 'টুনুর পৃথিবী ভ্রমণ', 'পাতালে বছর পাঁচেক' প্রভৃতি), ভৌতিক কাহিনি (যেমন 'আমার ভূত দেখা', 'আশ্রমপীড়া', 'ভূত আর ভূতো', 'বাইশ ইঞ্চি পা', 'লক্ষণ এবং দুর্লক্ষণ' প্রভৃতি), উপস্থিত বুদ্ধির চমক (যেমন 'ঘটোৎকচ বধ', 'মন্টুর মাস্টার', 'পণ্ডিত বিদায়', 'চূড়ান্তকর গৃহপ্রবেশ' প্রভৃতি), শিশুমনের খেয়ালীপনা (যেমন 'টুনুর পৃথিবী ভ্রমণ', 'স্বাবলম্বনের অনেক সুবিধা', 'টুসির মুসকিল', 'মন্টুর গোয়েন্দা গিরি' প্রভৃতি), গোয়েন্দাগিরি নিয়ে উপহাস (যেমন 'গদাই-এর গোয়েন্দাগিরি', 'অমলের গোয়েন্দাগিরি', 'টিকটিকির ল্যাজের দিক', 'ডিকেটটিভ শ্রী ভর্তৃহরি', 'কঙ্কেকাশির কাণ্ড' প্রভৃতি) প্রভৃতি বিষয় নিয়ে সর্বোপরি ঘটনার বৈচিত্র্যময় আকর্ষণীয় উপস্থাপনা ও অবিশ্বাস্য কাহিনিকে বিশ্বাসযোগ্য করার প্রবণতা (যেমন 'আমার ভালুকশিকার', 'আমার ব্যাঘ্রপ্রাপ্তি', 'হাতির সঙ্গে হাতাহাতি', 'ঘোড়ার সঙ্গে ঘোরাঘুরি' প্রভৃতি) এবং সেই সঙ্গে শব্দের খেলা ও উপমা রূপকাদির উপস্থিতি শিবরামের ছোটোদের গল্পে লক্ষ করা যায়।

আবার বড়দের গল্পে বিশেষত নরনারীর প্রেম (যেমন 'প্রেমের বি-চিত্র গতি', 'গুম্ফবতী', 'কল্পনার সাথে বিয়ে', 'ইঁদুর ধরা কল' প্রভৃতি), দাম্পত্য জীবন (যেমন 'স্বামী মানেই আসামী', 'অথ দাম্পত্য কথা', 'স্বামী হওয়ার সুখ', 'স্ত্রী মানেই ইস্ত্রি' প্রভৃতি), ধর্ম (যেমন 'ধাপে ধাপে শিক্ষা লাভ', 'দেশের মধ্যে নিরুদ্দেশ', 'টুকটুকির গল্প', 'দেবতার জন্ম' প্রভৃতি), আধুনিক সাহিত্যচর্চা (যেমন 'আমার সম্পাদক শিকার', 'গল্পের উপসংহার', 'দানবের জন্ম', 'সাহিত্যিক সাক্ষাৎ' প্রভৃতি) প্রভৃতি বিষয়ে এমনকি নিজেকেও উপহাস্য করে হাসির গল্প হাসিল করেছেন। কিন্তু শিবরামের হাস্যরসের গল্পগুলি নিতান্তই হাসির গল্প নয়।

অনেক গল্পেই বাস্তব জীবনবোধের ও গভীর অভিজ্ঞতার নিজস্ব দৃষ্টিপাতের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

অবশ্য এ বিষয়ে বাংলা ছোটোগল্পের বিশিষ্ট সমালোচক ভূদেব চৌধুরী ভিন্ন মত পোষণ করে বলেছেন —

''নিরুদ্দেশ হাল্কা হাসি ছাড়া আর কোনো গুরুগম্ভীর তত্ত্ব, তথ্য, জীবনদর্শন অথবা সুচিন্তিত আঙ্গিক পারিপাট্য শিবরামের গল্পে খুঁজতে গেলে ব্যর্থ হতেই হবে।''[১৭]

কিন্তু অলোক রায়, ইরাবান বসুরায়, পল্লব সেনগুপ্ত প্রমুখেরা তাঁদের প্রবন্ধে একাধিক গল্প অলোচনা করে শিবরামের হাসির গল্পে হাসি ছাড়াও তাঁর গুরু-গম্ভীর দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি আলোকপাত করেছেন। শিবরাম নিজেও মনে করেন হাসির গল্প শুধুমাত্র হাস্যকর বিষয়কেই উপস্থাপিত করে না। তাঁর কথায় —

''হাসির গল্প হলেই তার সাতখুন মাপ নয়। আজকের রাষ্ট্র - সমাজ - জীবন- সমস্যা সমস্ত এড়িয়ে গজদন্ত মিনারে বসে নিজের গজদাঁত বার করবে এযুগের হাস্যরসিকের পক্ষে সেটা আর সম্ভব হচ্ছে না। 'সিরিয়াস' সাহিত্যের বেলায় যেমন, আকাশের ফুল হলে চলে না, মাটির গর্ভে মূল রাখতে হয়, হিউমরস্ সাহিত্যেও তাই। নিজের নিভৃতে বসে ফোটা হয়তো যায়, কিন্তু জীবনের ভিতে, চারিভিতেই শেকড় থাকা চাই।''[১৮]

যেমন ছোটোদের তেমনই বড়দের একাধিক গল্পে তার প্রতিফলন ঘটেছে। যেমন তাঁর প্রথম ছোটোদের হাসির গল্প 'পঞ্চাননের অশ্বমেধ ' গল্পটি। নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার নিরিখে শিবরাম গল্পটি লিখেছেন। 'বৃদ্ধ' 'অকেজো' ঘোড়াকে নিয়ে পঞ্চাননের সমস্যার অন্ত নেই। খাদ্য যোগাতেও যেমন তিনি পারেন না, আবার বিক্রিও করে উঠতে ব্যর্থ হন। এদিকে ঘোড়াটি খিদের জ্বালায় বাড়ির অনেক খাদ্যাখাদ্য নষ্ট করে দেয়। অবশেষে কৌশলে জ্যোতিষ বোসের কাছে ঘোড়াটি পনের টাকা এগার আনা তিন পাইয়ে বিক্রি করে লাভই করেন পঞ্চানন। বড়লোক জ্যোতিষ বোস ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার পর ঘোড়াটি আস্তাবলে প্রচুর খাদ্য দেখে চ্যাঁ হ্যাঁঃ হ্যাঁঃ হ্যাঁঃ বিকট চিৎকার করতে করতে ''হাসতে হাসতে মারা গেলেন।'' শিবরাম জানিয়েছেন ''আসলে সেই ঘোড়াটা আর কেউ নয়, এই আমিই।''[১৯]

এই গল্পটি লেখার জন্য আগাম দক্ষিণা পেয়েছিলেন সেকথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। আর্থিক দৈন্যে পীড়িত শিবরাম ঘোড়াটার মাধ্যমে নিজের জীবনের করুণ দিকটিকে সরস ভঙ্গিতে যেমন তুলে ধরেছেন, তেমনই সমাজের নিপীড়িত দারিদ্রপীড়িত অসহায় বুভুক্ষু মানুষের সামনে হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে রাজপ্রাসাদ ও রাজভোগ প্রাপ্তি ঘটলে যে অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তাকেও ব্যঞ্জিত করেছেন। ফলে গল্পটিকে নিতান্তই হাসির গল্প হিসাবে অভিহিত করা ঠিক হবে না। কারণ হাস্যরস পরিবেশনেই গল্পটি সীমিত থাকেনি। গল্পের পরিসমাপ্তিতে শিবরাম গভীর জীবন সত্যের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

আবার বড়দের জন্য লেখা শিবরামের জনপ্রিয় গল্প 'দেবতার জন্ম'-এ হাস্যরসের মাধমে আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগেও সংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মভীরু মানুষের কাছে পথের ধারের নুড়ি পাথরও যে দেবতার আসনে সমাসীন হতে পারে তারই সার্থক রূপায়ণ লক্ষ করা যায়। গল্পকথক বাড়ি থেকে বেরিয়ে প্রায়ই একটি রাস্তায় পড়ে থাকা নুড়িতে হোঁচট লাগায় একদিন খুঁড়ে সেটিকে এক নিরাপদ কোণে রেখে দেন। হঠাৎ পরিশ্রম করে পাথরটি রাস্তা থেকে তুলে ফেলার প্রচেষ্টায় কৌতূহলী জনতার জমায়েতে স্বপ্নাদেশের কথা উত্থাপিত হয় এবং অচিরেই গল্পকথক লক্ষ করেন সেই পাথরের নুড়িটি 'ত্রিলোকেশ্বর শিব'-এ পরিণত হয়েছে। আরও আশ্চর্যের বিষয় জনতার মাঝে যে লোকটি স্বপ্নাদেশের সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন তিনিই শিবের সনিষ্ঠ এবং সক্রিয় সেবায়েত। গল্পকথকও মহামারী থেকে বাচাঁর জন্য জেনে-বুঝে আত্মতুষ্টির ব্যাখ্যা খুঁজে অবশেষে সেই ত্রিলোকেশ্বর শিবরূপে পাথরের কাছে প্রাণ ভিক্ষা চেয়েছেন —

> "প্রার্থনা করলাম, বাবা, আমার মূঢ়তা মার্জনা করো, মহামারীর কবল থেকে বাঁচাও আমাকে এযাত্রা। খানিক দূরে এগিয়ে এসে ফিরলাম আবার। নাঃ, দেবতাকে ফাঁকি দেওয়া কিছু নয়। মুখের ফুসকুড়িগুলো হাত দিয়ে আঁচ করা গেল—এগুলো ব্রণ, না বসন্ত?
>
> এবার মাটিতে মাথা লুটিয়ে প্রণাম করলাম। বললাম — জয় বাবা ত্রিলোক নাথ। রক্ষা করো বাবা। বম্ বম্!
>
> উঠে দাঁড়িয়ে চারিদিক দেখলাম। কেউ দেখে ফ্যালেনিতো?"

ধর্মভীরু মানুষের মনের দুর্বলতার সুযোগে একশ্রেণির ভণ্ডমানুষের স্বার্থসিদ্ধির জন্য পথে ঘাটে অসংখ্য দেবতার জন্ম হচ্ছে এ যুগেও। এরকমই বিষয়ে আরেকটি গল্প 'টুকটুকির গল্প'-এ গল্পকথক জানিয়েছেন—

> "ভুঁইফোঁড় ঠাকুরদের নিয়ে রাতারাতি দেবস্থান খাড়া করে মাতামাতি সেই কলকাতার ফুটপাথেই যা দেখেছি। সেই কলকাতাই কি অ্যাদ্দুর অব্দি ত্রসে হামলা করতে লেগেছে নাকি? কী সর্বনাশ!
>
> অতিক্ষীণ ফুটপাথও ধারে কাছে নেই। সুবিস্তৃত জলাশয়ের পৈঠা ঘেঁষে সদ্যোজাত পীঠস্থানটি দাঁড়িয়ে। ফুটপাথেই যখন দেবতাদের পদপাত হয়ে থাকে তখন আশা করা যায় অচিরেই এখানে একটা ফুটপাথ গজাতেও দেখা যাবে।"

এরকম ধর্মান্ধতার অন্তঃসারশূন্যতা ও ভণ্ডধার্মিকতাকে নিয়ে শিবরাম একাধিক গল্প লিখেছেন।

আবার প্রাবন্ধিক শিবরামের ঋজু যুক্তিবাদী মননশীল মানসিকতা তাঁর হাসির গল্পেও লক্ষ করা যায়। শিবরাম তাঁর প্রবন্ধে রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ এবং অনুরূপ প্রতিষ্ঠানকে সাঙ্ঘাতিক না বলে Lesser Brain-এর কেরামতি বলে উল্লেখ করেছেন। 'মানুষ নিজের ভেতর থেকে হয়ে ওঠে, তাকে করে তোলা যায় না; করে তুলতে গেলেই সে আর যাই হোক মানুষ হয়না' বলে তাঁর বিশ্বাস ছিল।[২০]

সেকথাই 'ধাপে ধাপে শিক্ষালাভ' গল্পটিতে লক্ষণীয়। শিবরামের হাসির গল্পের জনপ্রিয় দুই ভাই হর্ষবধর্ন ও গোবর্ধনকে নিয়ে লেখা গল্পটিতে রসিকতার ছলে রামকৃষ্ণ মিশনের ধর্ম শিক্ষা বিষয়ে পরিহাস করেছেন। রোয়াকে পড়ে গিয়ে পা ভাঙায় রামকৃষ্ণ মিশনের নামকরা সেবাশ্রমে গিয়ে সুস্থ হয়ে এসেও মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন হর্ষবর্ধন। কারণ ঠাকুরের শ্রীচরণে কি করে ঠাঁই পাবেন এই চিন্তায় চিন্তিত হয়ে পড়েন। গল্পকথক জানিয়েছেন ইহলোক -পরলোক কোথাও পরমহংসদেবের পায়ের অবশিষ্ট নেই বলে তার ধারণা। তবে তিনি জানিয়েছেন —

"তাঁর পার্ষদ বর্গের আর কেউ পেয়েছেন মনে হয় না। তবে অচিন্ত্যনীয় উপায়ে কেউ যদি পায়ে ঠাঁই পেয়ে থাকে বলা যায় না।"

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে সাহিত্যিক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত শ্রীরামকৃষ্ণের গভীর অনুরাগী ভক্ত হয়েছিলেন। আত্মজীবনীতেও তাঁকে নিয়ে শিবরাম রসিকতা করেছেন। গল্পকথক ধর্মগুরুর সন্ধান দিতে অপরাগ কারণ —

"ধর্মকে আমি গুরত্ব দিইনি কোনোদিন, এ জীবনে কখনো ধার ধারিনি তার।"

তাছাড়া —

"খোদায় মালুম। খোদার উপর খোদকারী করার লোক কোথায় থাকেন, কোনো ঘুপচির মধ্যে, কোনো আশ্রমের গর্ভে কি হিমালয়ের গহ্বরে আমার জানা নেই। স্বামীজিরা স্ত্রীজিরা কোথায় কোথায় আছেন যেন শুনেছি—পাপীতাপীদের উদ্ধার করার জন্যেই। আমার জানা নেই। জানবার উৎসাহও নেই। পাপী মানুষ কিন্তু তাপী নই, পাপের উপর ধর্মের সন্তাপ বাড়িয়ে উত্তপ্ত হবার বাসনা নেই আমার।"

গল্পকথকের অভিব্যক্তির মধ্যে প্রাবন্ধিক শিবরামের প্রতিধ্বনিই শোনা যায়। অবশেষে গোবর্ধনই দাদার বাকি অর্ধেক ধর্মশিক্ষার জন্য অন্যপাটি ভাঙতে বলেন। প্রথমে রাগ করলেও শেষে হর্ষবর্ধন ভাইয়ের যুক্তি মেনে নেয়—কিন্তু আস্ত পা'টা ভাঙবে কি করে এই তার চিন্তা। গোবর্ধনের শেষ সংলাপ যেমন হাস্যরসের

আমদানি হয়, তেমনই ধর্মশিক্ষা উপহাস্য হয়ে ওঠে —

"কিছু শক্ত নয় দাদা, খুব সহজ, রোয়াকের এই তিনটে ধাপ দেখছ তো? সেদিন যা তুমি দেখতে পাওনি বলেই পা ফসকে এই ধর্মশিক্ষা লাভের সুযোগটা পেলে না? ওই ধাপ দিয়ে উটমুখো হয়ে উটকোর মতোই আবার তুমি উঠানামা করো, তাহলেই হয়ে যাবে। সব শিক্ষাই ধাপে ধাপে পেতে হয়, তাই না? তোমার ওই ধর্মশিক্ষা মানে, ধর্মশিক্ষার বাকি আধখানা পেতে হলেও তাই করতে হবে তোমাকে। এগুতে হবে এই ধাপে ধাপে।'

'ধাপে ধাপে?'

'ধর্মকে ধাপ্পা বলে না দাদা? এই জন্যেই তো?' "

এই গল্পেরই পরিপূরক গল্প হিসাবে 'দেশের মধ্যে নিরুদ্দেশ' গল্পটি সবিশেষ উল্লেখ্য। ধর্মপ্রাণ হর্ষবর্ধনের ধর্মশিক্ষাদাতা স্বামীজীর ঋণ শোধ করার জন্য অনেকদিন পরে নিজেদের দেশ আসামে ফিরে পরমহংসদেবের সর্বধর্মসমন্বয় মন্দির নির্মাণের সদিচ্ছা পোষণ করেন। সেইভাবে গোবর্ধন গ্রামের পরিচিত চর্মকার হারুকে দায়িত্ব দিয়ে তার নামে লক্ষ টাকা ব্যাঙ্কে জমা করে কলকাতায় ফিরে যায়। পরের বছর রথযাত্রার দিনে দুই ভাই সর্বধর্ম সমন্বয় মন্দিরের দ্বারোদ্‌ঘটনে এসে বিস্মিত হয়ে যায় —

"বাজারের মধ্যিখানে বৃত্তাকারে সারি সারি পায়খানা!

'এ কী! হারুদা, মন্দির কই! আমার সমন্বয় মন্দির? এতো কেবল পায়খানা দেখছি দাদা।' "

হারুর কথাতে হাসি ও পরিহাস যুগপৎই ব্যঞ্জিত হয় —

"প্রথমে ভেবেছিলাম যে মন্দির বানাবো। শিবমন্দির। তার পর ভেবে দেখলাম, সেটা ঠিক হবে না। সেখানে কেবল হিন্দুরাই আসবে, মুসলমান ক্রিশ্চান এরা কেউ ছায়া মাড়াবে না তার। মসজিদ গড়লেও সেই কথা। মুসলমান ছাড়া আর কেউই যে যাবে না তার দরজায়। গির্জায় হলেও তাই। যাই করতে যাই, সর্বধর্মসমন্বয় আর হয়না। তাছাড়া, পাশাপাশি মন্দির মসজিদ গির্জা গড়লে একদিন হয়তো মারামারি লাঠালাঠিও বেধে যেতে পারে। তাই অনেক ভেবে-চিন্তে এই পায়খানাই বানিয়েছি। সবাই আসছে এখানে। আসবে চিরদিন। হিন্দু মসলমান জৈন পারসি ফেরেস্তান। কেউ বাকি থাকবে না। ..... আর এধারে আদ্ধেকটা জুড়ে বসিয়েছি এক পাইস হোটেল। হাটে বাজারে যারাই আসে সস্তায় যেন তারা দুমুঠো খেতে পায় ....."

এছাড়া উগ্র ব্রাহ্মণ্যবাদী মানসিকতাকে পরিহাস করে 'যখন যেমন তখন তেমন' পণ্ডিচেরির আশ্রমকে উপহাস্য করে 'হরগোবিন্দের যোগফল' কিংবা ধর্মকে ব্যক্তিস্বার্থে ব্যবহার করে মহাপুরুষের মুখোশে প্রচুর অর্থ উপার্জনের স্বরূপ তুলে ধরে 'বক্কেশ্বরের লক্ষ্যভেদ' প্রভৃতি গল্পে হাসির আড়ালে সমাজের দুর্বল দিকগুলির প্রকৃতি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন গল্পকার। তাই গল্পগুলি নিতান্তই হাসির গল্প হয়ে ওঠেনি। তা বলাই বাহুল্য।

শুধু ধর্মকে নিয়েই নয়, একাধিক সিরিয়াস বিষয়েও শিবরামের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর অনেক হাসির গল্পের মধ্যেই লক্ষ করা যায়। সরকারী কাজকর্মের দীর্ঘসূত্রিতার করুণ পরিণতির স্বরূপ তুলে ধরে শিবরাম 'কালান্তক লালফিতা'র মতো অসাধারণ গল্প রচনা করেছেন। শুরুতেই গল্পটির অবিশ্বাসের ছায়া লক্ষ করা যায় —

"আমি আত্মহত্যা করার পর দিনকতক তাই নিয়ে বেজায় হৈ-চৈ হয়েছিল।"

মৃত ব্যক্তি গল্প বলেছেন। কিন্তু তা হয়ত গল্পলেখকের গল্প লেখার কৌশলমাত্র। কারণ গল্প-কথকের আত্মহত্যার মূল কারণই গল্পের প্রতিপাদ্য বিষয়। সরকারী অফিসের কালান্তক লাল ফিতার ফাইল থেকে কার্যোদ্ধার করতে গিয়ে কত শোচনীয় অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়, তারই সরস উপস্থাপনা গল্পটিতে পর্যায়ক্রমে লক্ষ করা যায়। গল্প কথক পরিষ্কার করে জানিয়েছেন —

"লালফিতার একটা নিজের ধর্ম আছে। পৃথিবীতে যত ism আবিষ্কৃত হয়েছে, Buddhism থেকে শুরু করে rheumatism পর্যন্ত, Red-Tapism তাদের কারুর চেয়ে কিছু কম যায় না। আমার মতে এই লালফিতার ধর্মই সবচেয়ে বেশি পরাক্রান্ত, কেননা, পরকে আক্রমণ করতে আর করে কাবু করতে এর জুড়ি আর নেইকো।"

এর পরেই গল্পকথক তার গল্প শুরু করেছেন। ১৭৭৭ সালের পয়লা এপ্রিল নাগাদ বিক্রমপুরের বলরাম পাঠকের ওয়ারেন হেস্টিংস সরকারের এক হাজার খাসী বা পাঁঠা সরবরাহের চুক্তি বাবদ পাওনা ২১ হাজার টাকা ১৫৬ বছর ধরে সরাসরি কিংবা দূর আত্মীয় উত্তরাধিকারীরা অনেক চেষ্টা চরিত্র করেও অফিসের লালফিতার বাঁধন থেকে অর্থোদ্ধার করতে পারেনি। তার মধ্যে শেষ উত্তরাধিকারী গল্পকথক স্বয়ং। প্রায় প্রতিজ্ঞাপূর্বক টাকা আদায় করতে গিয়ে গল্পকথক বহু প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানে 'ঢুঁ' মেরেও অর্থ আদায়ের সুরাহা করতে প্রচেষ্টা চালান। অবশেষে ১৯৩৩ সালের মার্চের শেষ সপ্তাহে বহুবাঞ্ছিত চিঠি আসে। চিঠি পেয়ে অফিসে গিয়ে জানতে পারেন ২১ হাজার টাকা সুদে আসলে বেড়ে আড়াই লাখ টাকার উপর হয়েছে। অথচ গল্পকথক সেদিনও টাকা পেলেন না। কারণ "এখনো একটা সই বাকি আছে কিনা।" গল্পকথক ভাবলেন পয়লা এপ্রিল বলেই বোধ হয় অফিসের বাবুটি পরিহাস করছেন। আসল ঘটনা জানার পর গল্প কথক দশবছর ধরে আঁকড়ে থাকা ধৈর্য আর ধরে রাখতে পারলেন না। সরকারী অফিসের প্রাপ্য টাকা 'অখণ্ড পরমায়ু' সম্পন্ন দেশবাসীকে উইল করে দিয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেন।

মূল গল্পের শুরু এবং শেষ পয়লা এপ্রিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। April fool বলরাম পাঠকের ভাগ্যকে পরিহাস করে যেমন, তেমনই সরকারী অফিসের কাজকর্মকে উপহাসের বিষয় করে তোলে।

'কালান্তক লালফিতা'র পরিপূরক একটি গল্প 'গিনিপিগ আর গিনিপিগ' তথা 'পিগ মানে শুয়োর ছানা'। সরকারী বিধি এবং আমলাতান্ত্রিক পরিকাঠামো কত জটিল পরিস্থিতি তথা সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে তারই সরস উপস্থাপনা গল্পটিতে লক্ষ করা যায়। গল্পকথকের নকুড়মামা উপহার প্রেরিত একজোড়া গিনিপিগের বাচ্চা খালাস করতে এলে কাঁকুড়গাছির স্টেশন মাস্টার নকুলবাবু রেল-আইন অনুসারে প্রতিটির জন্য পাঁচ আনা করে মাশুল চাওয়ায় ভীষণ রেগে যান। তিনি প্রতিটি গিনিপিগের জন্য চার আনা করে তিনি দিতে চান। নকুলবাবুকে বোঝানোরও চেষ্টা করেন তিনি, গিনিপিগ আর পিগ এক নয়।

অগত্যা বোঝাতে ব্যর্থ হয়ে নকুড়মামা বাড়ি চলে আসেন। একদিকে রেলওয়ে এজেন্ট, রেলওয়ে ক্লেমস বিভাগ এবং রেলওয়ে ট্রাফিক বিভাগে চিঠি চালাচালি চলতে থাকে, অন্যদিকে ১১ সপ্তাহের মধ্যে একজোড়া গিনিপিগ চার জোড়ায় দাঁড়ায়। এদিকে তাদের আহারাদির বন্দোবস্ত বাবদ খরচ বিষয়ে রেলওয়ে হেড অফিসে নকুলবাবু চিঠি আদান প্রদান করতে করতে সংখ্যা যখন চার হাজারে দাঁড়াল, তখন হুকুম হল দুটি গিনিপিগের মাশুল বাবদ আট আনা আদায় করে প্রাপককে সমস্ত গিনিপিগ দিয়ে দেওয়ার। অন্যদিকে দেখা গেল নকুড়মামার বাড়ির বারান্দায় 'To let' এর নোটিশ ঝোলানো। অবশেষে দশ ওয়াগন ভর্তি গিনিপিগ বহু তদ্বির করে হেড অফিসে পাঠানো হয়। নকুলবাবু ইনস্পেকটরকে জানিয়ে দেন এবার থেকে সব পশুরই চার আনা করে মাশুল ধার্য করবেন। সরকারী বিধি ও আমলাতান্ত্রিক পরিকাঠামোয় দীর্ঘসূত্রিতার সঙ্গে অর্থের অপচয় এবং অনিয়ন্ত্রিত পরিস্থিতিকে রসিকতার ছলে গল্পকার উপহাস্য করে তুলেছেন।

এভাবে আধুনিক অর্থনীতিকে পরিহাস করে (যেমন 'গন্ধ চুরির মামলা', 'ঋণংকৃত্বা' প্রভৃতি), সাহিত্য চর্চার দুর্বলতাকে উপহাস্য করে (যেমন 'দানবের জন্ম', 'আমার সম্পাদক শিকার' 'হর্ষবর্ধনের কাব্যচর্চা', 'লেখকের কলম', 'গল্পের উপসংহার', 'সাহিত্যিক সাক্ষাৎ' প্রভৃতি), শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ের দুর্বল দিকগুলি তুলে ধরে (যেমন 'ইংরিজি যার নাম', 'পরোপকারের বিপদ', 'শিক্ষাদান', 'শিশুশিক্ষার পরিণাম' প্রভৃতি) লেখা গল্পগুলি হাসির গল্প হিসাবে পরিচিতি থাকলেও তা যে নিতান্তই হাসির গল্প নয়, তা বলাই বাহুল্য।

কতকগুলি গল্প গুরু-গম্ভীর বিষয়ের অবতারণা না করেও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে শিবরামের আত্মোপলব্ধির গভীরতায়। এধরনের গল্পগুলির মধ্যে 'দায়ভাগ', 'একদা এক কুকুরের পা ভাঙিয়া ছিল', 'জীবনদর্শন', 'একটি বেতার ঘটিত দুর্ঘটনা' প্রভৃতি উল্লেখ্য। যেমন 'দায়ভাগ' গল্পে সমাজের অবহেলিত ছেলেদের পরোপকার করার নিঃস্বার্থ মনোবৃত্তির উজ্জ্বল দিকটির সার্থক রূপায়ণ লক্ষ করা যায়। গল্পটির সমাপ্তিতে হাসির চেয়ে পাঠকের আত্মজিজ্ঞাসাকে জাগিয়ে তোলে গল্পকথক। তার অন্তিম উপলব্ধিই গল্পটির উপসংহার —

"পরির জন্য করে সবাই—পরের জন্য কেউ কিছু করতে যায় কি কখনো? পারে কেউ করতে? পারলে পরে এরাই পারে—এই ছেলেরাই। এরা কারো পর নয়, আপনারও নয় কারো—পরাৎপরের ন্যায় এই ছেলেরাই আপনপর নির্বিশেষে সবার জন্যে করে যায় নির্বিচারে। যা করার, যা না করার।

সবার দায় এরা পোহায়। কেবল সার্বজনীনের চাঁদা আদায়ই নয়—পাড়ার সবার দায়িত্বও এরা নেয়—এই চাঁদরাই।"

অনেক সময় শিবরামের অতিরিক্ত বক্তব্য প্রবণতা হাসির গল্পের গতিকে ব্যাহত করে ভারাক্রান্ত করে তোলে। যেমন প্রেম সম্পর্কিত বড়দের হাসির গল্প 'প্রেমের পথ ঘোরাল'। গল্পটিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যুদ্ধকালীন সাহিত্যের রূপ কী হতে পারে এবিষয়ে দীর্ঘ বক্তব্য গল্পের গতিকে মন্থর করে দিয়েছে যেমন, তেমনই করে গল্পকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছেন —

"যুদ্ধকালীন সাহিত্যের রূপ কী হতে পারে ? বাস্তবিক, এটা একটা ভাবনার বিষয় বটে। যখন আমরা ভালোবাসি তখন আমরা ভালোবাসার কোন রূপ দিতে পারি না। ভাবতেই পারিনা সে সম্বন্ধে। ..... অবশ্যি, যুদ্ধের সময়ে ঐকান্তিক প্রেমের গল্প লেখা সম্ভব কিম্বা সহজ না হতে পারে, কিন্তু যুদ্ধের গল্প লিখলেই যে তা সার্থক হবে—এবং তাই লেখাই সর্বতো প্রয়োজন তার কী মানে আছে ?

তবে সাহিত্যের রূপ যাই হোক .....
অবশ্যি, খাঁটি সাহিত্যের পক্ষে সামরিক রসায়নলাভের সম্ভাবনা এসময়ে না থাকলেও, খাঁটি সাহিত্যিকের পক্ষে সামরিক রূপ নেবার কোনো বাধা ছিল না বোধ হয়। ..... সাহিত্যসভায় গিয়ে এই নব রূপকথা ব্যক্ত করব কিনা ভাবি একবার।"

আবার এই অতি বক্তব্য প্রবণতার জন্য হাসির গল্পের হাসি উবে যায়। যেমন 'সভ্য সমাজের যে সব অসুবিধে' গল্পটি। এই গল্পে সাম্যবাদের কথা পিঁপড়েদের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। পিঁপড়েরাই যে জনগণ তাও গল্পকার ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়েছেন —

"সত্যি বলতে পিপীলিকারাই তো একমাত্র People — তাদের জন্যেই এতোবড়ো পৃথিবী।"

একটি বানপ্রস্থগামী পিঁপড়ের মুখদিয়ে আধুনিক সভ্যতার সমালোচনা করে অবশেষে অন্য একটি পিঁপড়ের মাধ্যমে সাম্যবাদের কথা ব্যক্ত করেছেন —

''আদিম সরল জীবনে তো সম্পত্তি বলে বালাই নেই। কোনো কিছুর ওপরেই কারো ব্যক্তিগত অধিকার কি তখন থাকতে পারে ? ভেবে দেখলে ওসব হচ্ছে সভ্য সমাজেরই তৈরি কৃত্রিম যতো আইন-কানুন। অত্যন্ত বিশ্রী ব্যাপার—তাই নয় কি?''

বানপ্রস্থগামী পিঁপড়ের পিঠে বাহিত চিনির টুকরো কেড়ে নেওয়ার কথাও জানায় অন্য পিঁপড়েটি—

''অবশ্যি, এমনি যদি না দাও তো কেড়ে নিতে হবে। একলা যদি গায়ের জোরে না পেরে উঠি তো, আরো সব পিঁপড়েদের আমি ডেকে আনব। দশ জনে মিলে একজনকে হটিয়ে দিতে কতক্ষণ?''

ফলে অরণ্যগামী পিঁপড়েটি চিনির টুকরো ছেড়ে পুনরায় বাড়ি ফিরে আসে। এভাবে বিষয়টি রসিকতা করার ফলে গল্পে হাসি উবে গিয়ে বক্তব্যই প্রধান হয়ে উঠেছে।

শিবরামের গল্পে বিষয়-ভাবনার সঙ্গে আঙ্গিক-প্রকরণের অভিনবত্বও লক্ষ করা যায়। গল্পকে নিয়ে তিনি ভাবনা চিন্তা করতেন তা তাঁর গল্পের গঠন লক্ষ করলে বোঝা যায়। যেমন বিদেশী গল্পের অনুবাদে, তেমনি নিজের মৌলিক গল্প রচনায়। যেমন আমেরিকার রসসাহিত্যিক মার্ক টোয়েনের একটি বিখ্যাত গল্প 'How I Edited an Agricultural Paper' গল্পটির স্বচ্ছন্দ অনুবাদ করে 'আমার সম্পাদক শিকার' গল্পটি লিখেছেন। অথচ নিজস্ব বাচনভঙ্গি ও উপস্থাপন দক্ষতায় গল্পটি কতখানি উপাদেয় হয়ে উঠেছে তা মূল গল্পের সঙ্গে প্রতিতুলনা করলে সহজেই উপলব্ধি করা যায়। শিবরামের গল্পের আঙ্গিক পারিপাট্য কতটা সুদৃঢ় তা সচেতন পাঠক মাত্রই এ থেকে উপলব্ধি করতে পারবেন। মার্ক টোয়েনের গল্পটির শিরোনাম 'কীভাবে আমি একখানি কৃষিপত্রিকা সম্পাদনা করেছিলাম'। গল্পটি শুরু হয়েছে —

বিপদ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়ে কৃষি পত্রিকাখানির অস্থায়ী সম্পাদক-পদ আমি গ্রহণ করিনি। কোনো স্থলবাসী মানুষই বিপদ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়ে জাহাজের প্রধান নাবিকের পদ নিতে পারে না। কিন্তু তখন আমার যা অবস্থা তাতে মাইনের কথাটাই ছিল বড়। নিয়মিত সম্পাদক তখন ছুটিতে যাচ্ছিল, আর তার প্রস্তাব মতোই চাকুরিটা নিয়ে আমি তার জায়গায় বসলাম।

অথচ শিবরাম গল্পটি শুরু করেছেন —

''হাম কিংবা টাইফয়েড্, সর্পাঘাত কিংবা মোটর-চাপা, জলে ডোবা কিংবা গাছ থেকে পড়ে যাওয়া, এগজামিনে ফেল করা কিংবা কাঁকড়া-বিছে কামড়ানো—জন্মাবার পর এর কোনোটা না - কোনোটা

কারু না-কারু বরাতে কখনো-না-কখনো একবার ঘটেই। অবশ্য যে মটর-চাপা পড়ে তার সর্পাঘাত হওয়া খুব দুরূহ ব্যাপার, সেরকম আশঙ্কা প্রায় নেই বললেই হয়, এবং যায় সর্পাঘাত হয় তাকে আর গাছথেকে পড়তে হয় না। যে ব্যক্তি জলে ডুবে যায় মোটর-চাপা পড়ার সুযোগ তার যৎসামান্যই এবং উঁচু দেখে গাছ থেকে ভালো করে পড়তে পারলে তার আর জলে ডোবা ভয় থাকে না। তবে কাঁকড়া বিছের কামড়ের পরেও এগজামিনে ফেল করা সম্ভব, এবং অনেক ক্ষেত্রে হামের ধাক্কা সামলাবার পরেও টাইফয়েড হতে দেখা গেছে।

কিন্তু বলেইছি, এসব কারু-না-কারু অদৃষ্টে ঘটে কখনো বা কদাচ। কিন্তু একটা দুর্ঘটনা প্রায় সবারই জীবনে একটা নির্দিষ্ট সময়ে অনিবার্যরূপে প্রকট হয়, তার ব্যতিক্রম খুবই কম দেখা যায়। আমি গোঁফ ওঠার কথা বলছি না - তার চেয়েও শক্ত ব্যায়াম—গোঁফ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে লেখক হবার প্রেরণা মানুষকে পেয়ে বসে।''

এভাবে শিবরাম পৃষ্ঠা চারেক পরে অস্থায়ী সম্পাদক-পদে গল্পকথককে অধিষ্ঠিত করেছেন। গল্পকথকের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের তরুণ লেখকদের সমালোচনা করেছেন। অবশেষে মার্ক টোয়েনের মূলগল্পে প্রবেশ করেছেন। অথচ শিবরামের গল্পটি যেমন উপভোগ্য হয়েছে, তেমনই বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে।

মৌলিক গল্পের দিক থেকে শিবরামের উল্লেখযোগ্য বিষয় হল পত্রাকারে গল্প রচনা। যেমন 'পাত্রপাত্রী সংবাদ'[২১] 'পুতুলখেলা' এবং 'আমার ধন্যবাদ জানানো' প্রভৃতি । এই গল্পগুলি বিষয় ভাবনার দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ নয়, আঙ্গিকের দিক থেকেই এর বিশেষত্ব। সেই সঙ্গে গল্পগুলির নির্মল হাস্যরস উল্লেখ না করলেই নয়, যেমন 'পুতুলখেলা' গল্পের অংশ বিশেষ —

ইউরেকা স্টীম লণ্ড্রীর কর্ম্মকর্তা সমীপেষু —

না মশাই, আমার নামের আদ্যাক্ষর আমার সোয়েটারের কোনোখানে খোদাই করা নেই। আমি অবিবাহিত, কাজেই ঘরে আমার বৌ নেই যে তিনি সূচীশিল্পে নিজের পারদর্শিতা দেখাতে সোয়েটারের গায়ে আমার নাম তুলে দেবেন। বাড়িতে থাকতে আছেন এক বুড়ো পিসি, কিন্তু তিনি কোন কাজের নন।

ইতি

(২২-১১-৫২) শ্রী সাবিত্রী প্রঃ রায়

শ্রী সাবিত্রী প্রঃ রায় সমীপেষু —

সবিনয় নিবেদন —

আপনার পিসি কোনো কাজের নন জেনে আমরা দুঃখিত। যা হোক আপনার সোয়েটারের অনুসন্ধান চলছে, সেটি চিহ্নিত না হলেও এখান থেকে তার নিশ্চিহ্ন হবার কোনো আশঙ্কা নেই। ..... অতএব আপনি নিশ্চিন্ত থাকবেন।

ইতি,

বিনীত

কর্ম্মকর্ত্তা

(২৫-১১-৫২) ইউরেকা স্টীম লণ্ড্রী

একদিকে বিষয়ের বৈচিত্র্য ও অন্যদিকে আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা , উভয় ক্ষেত্রেই গল্পশিল্পী হিসাবে শিবরামের দক্ষতা প্রশংসনীয়। তাই পরিশেষে বলা যায়, গল্পকার শিবরাম চক্রবর্তী শুধুমাত্র সচেতন হাসির গল্পকারই নন, একজন সমাজসচেতন জীবনশিল্পীও বটে।

ঙ) সাময়িক পত্রের সম্পাদক শিবরাম

বাংলা সাহিত্যের প্রায় সব শাখায় অবাধে বিচরণকারী শিবরাম চক্রবর্তী একাধিক সাময়িক পত্র-পত্রিকা সম্পাদনাতেও বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। একদিকে যেমন স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিপ্লবীযুগের রাজনৈতিক পত্রিকার পুনরুজ্জীবন করেছিলেন, অন্যদিকে সামাজিক অবিচার-অনাচারের বিরুদ্ধে গণচেতনা জাগরণে তৎপর হয়েছিলেন। রুশ বিপ্লবোত্তর বাংলা সাময়িক পত্র-পত্রিকায় যে সাম্যবাদ প্রচার-প্রসারের জোয়ার এসেছিল, সম্পাদক শিবরাম চক্রবর্তী তাতে সামিল হয়েছিলেন। সাম্যবাদী সাহিত্যিক হিসাবে পূর্বের উপ-অধ্যায়গুলিতে তাঁর যে পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে সাময়িক পত্রের সম্পাদক হিসাবে শিবরামের ক্ষেত্রেও তা লক্ষ করা যায়। শুধু তাই নয়, ঐ অল্প বয়সে একাধিক রাজনৈতিক পত্রিকা সম্পাদনার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করে অসামান্য প্রতিভার পরিচয় যেমন দিয়েছেন, তেমনই ভবিষ্যতের সাহিত্যিক হিসাবে নিজেকে প্রস্তুত করেছেন।

ছোটোবেলা থেকে শিবরামের সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি পত্রিকা সম্পাদনার প্রতি বিশেষ অনুরাগ

লক্ষ করা যায়। তাই সশস্ত্র স্বাধীনতা আন্দোলনের চেয়ে 'অঞ্জলি' নামের স্বকল্পিত পত্রিকায় সাহিত্যচর্চায় তাঁর 'প্রবৃত্তি' হয়েছিল। অবশেষে একদিন শ্রী শিবরাম চক্রবর্তী কর্তৃক সম্পাদিত, লিখিত এবং প্রকাশিত হাতে লেখা দেওয়াল পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে। এই পত্রিকায় ছোটো সাইজের গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, হাস্যকৌতুক এমনকি ধারাবাহিক উপন্যাসও প্রকাশিত হত। বাড়িতে বাবার একাধিক সাহিত্য বিষয়ক সাময়িক পত্রিকা পাঠে অভ্যস্ত ও ঋদ্ধ শিবরাম-মানসে পত্রিকা সম্পাদনা বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছিল তা বলাই বাহুল্য।

অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে বাড়ি ছেড়ে কোলকাতায় এসে একসময় অর্থাভাবে কৈশোরোত্তীর্ণ শিবরাম খবরের কাগজ ফেরি করতে লাগেন। 'আনন্দবাজার', 'দৈনিক বসুমতী', 'আত্মশক্তি', 'বিজলী' প্রভৃতি পত্রিকা ফেরি করে বেড়ানোর সময়ই শিবরামের নিজের সম্পাদিত একটি পত্রিকা প্রকাশের সদিচ্ছা জেগে ওঠে। ইতিপূর্বেই 'ভারতী' ও 'বিজলী' পত্রিকায় তাঁর দু-একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। ঐ সময় অসহযোগ আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে বাংলার শিক্ষিত জনমানসে আন্দামান ফেরত অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের সম্পাদিত ও পরিচালিত সাময়িক পত্রিকাগুলি সাড়া ফেলে। শিবরামও তার দ্বারা প্রভাবিত হন। বিশেষ করে বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষের (১৮৮০ - ১৯৫৯) পরিচালিত 'বিজলী' (১৯২০) এবং উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৯-১৯৫০) সম্পাদিত 'আত্মশক্তি' (১৯২২) পত্রিকা দুটির দ্বারা শিবরাম সবিশেষ প্রভাবিত হন।

সেই সময়ে অত্যন্ত জনপ্রিয় সাপ্তাহিক পত্রিকা 'আত্মশক্তি' তৎকালীন বাংলা দেশের রাজনৈতিক জগতে অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করেছিল। রুশ মহাবিপ্লব সংক্রান্ত লেখালেখি এই পত্রিকাকে জনপ্রিয় করে তোলে। শিবরাম এই পত্রিকায় লেখার হাত পাকিয়েছিলেন। উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ই লেখালেখির বিষয়ে উচ্চশিক্ষায় স্বেচ্ছায় বঞ্চিত শিবরামকে উৎসাহ ও সাহস যুগিয়েছিলেন সবচেয়ে বেশি। বারীন্দ্র কুমার ঘোষের 'বিজলী' পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন নলিনীকান্ত সরকার (১৮৮৯-১৯৮৪)। তাঁর সম্পাদনায় 'বিজলী' পত্রিকা জনপ্রিয় হয়েছিল। শিবরাম এই পত্রিকার 'ঊনপঞ্চাশী' ও 'খড়কুটো' ফিচার দুটির দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হন। এছাড়া সেই সময়ে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের সবচেয়ে সাড়া জাগানো পত্রিকা 'ধূমকেতু' (১১ আগস্ট ১৯২২)ও শিবরামকে প্রভাবিত করে। তিনি নিজেও 'ধূমকেতু'র লেখক ছিলেন। নজরুলের 'বিপ্লবের প্রেরণায় ভরা' এবং 'খোলা খুলি রাজদ্রোহের কথায় সমৃদ্ধ' 'ধূমকেতু' অত্যধিক জনপ্রিয়তা অর্জনে সক্ষম হয়েছিল এবং 'সেই সময়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল' বলে শিবরাম নিজেই জানিয়েছেন। তরুণ শিবরাম এই রকম একটি পরিমণ্ডলে পত্রিকা সম্পাদনায় ব্রতী হয়েছিলেন।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষের (১৮৭২ - ১৯৫০) সহায়তায় ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত (১৮৮০-১৯৬১) ও অবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য (১৮৮২ - ১৯৬২) প্রমুখের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় বারীন্দ্র কুমার ঘোষের তত্ত্বাবধানে দেশে বৈপ্লবিক চেতনা জাগরণের জন্য ১৯০৬ সালে বিপ্লবীদের পত্রিকা সাপ্তাহিক 'যুগান্তর' প্রকাশিত হয়। কালক্রমে ইংরাজ সরকারের রোষানলে পড়ে বছর ছয়েকের মধ্যে পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ হয়ে

যায়।[১] সাড়া জাগানো এই বিপ্লবীদের রাজনৈতিক পত্রিকাটির নামে একটি পত্রিকা প্রকাশের জন্য অনুমতি চাইলে ইংরাজ সরকার শিবরামকে তা প্রদান করেন। ইংরাজ সরকার প্রদত্ত ডিক্লেয়ারেশন পেয়ে শিবরাম ১৯২৩ সালে নিজের মালিকানায় নবপর্যায় 'যুগান্তর' পত্রিকাটি সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। কিন্তু 'কাগজের মর্যাদা' বৃদ্ধির জন্য সেই সময়ে বীরেন্দ্রকুমার সেনকে 'যুগান্তরে'র নামমাত্র যুগ্ম সম্পাদক করেছিলেন। কৈশোরকালের বন্ধু গিরিজাকান্ত মুখার্জীকে শিবরাম পত্রিকাটির 'প্রিন্টার এবং পাবলিশার'-এর দায়িত্ব দেন। ১৩৪ নম্বর মুক্তারাম স্ট্রীটের মেসবাড়িই পত্রিকাটির কার্যালয়ে পরিণত হয়। নবপর্যায় 'যুগান্তরে'র 'আগাপাশতলা' 'আটপাতাই' শিবরাম নিজেই নানা নামে লিখতেন। তবে প্রবোধ সান্যাল 'পথিক' ছদ্মনামে, চারণকবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের মত কিছু তৎকালীন স্বল্পখ্যাত লেখকও লিখতেন। প্রায় সব ধরনের লেখাই পত্রিকাটিতে মজুত থাকত। শিবরামের কথায় —

"প্রথম পাতাতেই একটা কবিতা - একটু গরম গরম। তার পরে দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় সম্পাদকীয় ও সম্পাদকের মন্তব্য, তারপর গল্প-টল্প এক-আধটু, অনেকটা রূপকগর্ভ কথিকা জাতীয়, বিজলীতে উপেনদার ঊনপঞ্চাশীর মত একটু পলিটিক্যাল রসরচনা (উপেনদার লেখা সেকালে আমায় প্রভাবিত করেছে গোড়াতেই বলেছি) আর টুকরো খবরের ওপর টিপ্পনির চুটকি-কলম দুয়েক। এখনকার অল্পবিস্তরের প্রথম ভ্রূণ সেটাই।"[২]

টুকরো খবরের ও টিপ্পনির চুটকি শিবরাম লিখতেন নলিনীকান্ত সরকারের 'খড়কুটো'র ছায়া অবলম্বনে। শেষের দিকে 'যুগান্তর' সাপ্তাহিক পত্রিকাটি অনিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হোত। কিন্তু ঐ 'অগ্নিগর্ভ' সময়ে শিবরাম 'যুগান্তরে'র সম্পাদনাসূত্রে বিখ্যাত হয়েছিলেন, তেমনই কাগজটি চালানোর জন্য দেশবন্ধু থেকে বিধানচন্দ্র রায় পর্যন্ত অনেকেরই অর্থ সাহায্য পেয়েছেন।

নবপর্যায় 'যুগান্তরে'র বিশিষ্টতা ছিল উপস্থাপিত বক্তব্যের বিষয়বস্তুতে। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে প্রকাশিত অথচ তাতে দেশের চেয়ে মানুষের স্বাধীনতার বিষয়টিকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল। সমাজ ব্যবস্থায় অবিচার অনাচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধেই শিবরাম কলম ধরেছিলেন। শিবরামের সাম্যবাদী চিন্তাচেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল এই পত্রিকার মধ্য দিয়ে। তিনি জানিয়েছেন —

"ইংরাজের শাসন আমায় তেমন পীড়িত করেনি, যাকে বলে Social injustice সেইসব—যেমন অব্রাহ্মণদের ওপরে বামুনদের অত্যাচার, প্রজাদের ওপরে জমিদারের শোষণপেষণ—এই সবেই আমি বেশি অভিভূত হয়েছিলাম।"[৩]

এপ্রসঙ্গে স্মরণীয় শিবরাম কৈশোরেই জমিদারের অর্থে প্রতিপালিত হয়েও সেই জমিদারের অমানবিক শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রজাদের খেপিয়ে তুলেছিলেন। নিষ্ঠুর, নির্মম, দাম্ভিক ও ক্ষমতালিপ্সু সন্দেহবাতিক

সেই জমিদারের ইতিবৃত্ত ''জমিদারের রথ'' নামক উপন্যাসে প্রতিফলিত করে গণচেতনা জাগরণের প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। আর একটি বিষয় তা'হল রুশ বিপ্লবোত্তর সমাজতান্ত্রিক চিন্তাভাবনার চর্চা 'যুগান্তরে'র পূর্বেই উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আত্মশক্তি'তে শুরু হয়েছিল। শিবরাম তার দ্বারাও প্রভাবিত হয়ে থাকবেন।

প্রকাশের প্রথমদিকে শিবরামের 'যুগান্তর' পত্রিকাটি বেশ সাড়া ফেলেছিল। কিন্তু এই জনপ্রিয়তার মূলে পত্রিকাটির নাম মাহাত্ম্যকেই প্রাধান্য দিয়েছেন তিনি। অবশ্য পত্রিকাটি বেশি দিন চলেনি। 'ফুললো আর মরলো'-র মতো হঠাৎ ইংরাজ সরকারের রোষানলে পড়ে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র (৭ আষাঢ়, শুক্রবার ১৩৩০) খবর অনুযায়ী ১৯২৩ সালে ১৭ মে 'যুগান্তর' পত্রিকায় 'পৃথিবীর ঈশ্বর' শীর্ষক রাজদ্রোহজনক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় এবং ঐ পত্রিকায় (২২ শ্রাবণ, মঙ্গলবার, ১৩৩০) সংবাদ সূত্রে আরও জানা যায় উক্ত প্রবন্ধে নাকি জাতি বিদ্বেষের গন্ধ ছিল। তাই সংবাদপত্রের সম্পাদক ও প্রকাশকের ১৫৩ ধারায় কারাদণ্ড হয়।[৪] কিন্তু শিবরাম জানিয়েছেন 'যুগান্তরে'র প্রকাশিত একটি কবিতার বিরুদ্ধে অভিযোগের ভিত্তিতেই ইংরাজ সরকার রাজদ্রোহের মামলা করেছিল, কোনো প্রবন্ধের জন্য নয়। কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'উর্বশী' কবিতার প্যারডি 'ভূর্বশী'—যেকথা 'কবি শিবরাম' উপ-অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। ''কিন্তু কবিতাটি আদৌ ইংরাজ রাজের বিরুদ্ধে নয়। ছিল সেকালের জামিদার আর অত্যাচার অনাচারের বিরুদ্ধেই।''[৫] অবশেষে উপযুক্ত প্রমাণের অভাবেও শিবরামের একমাসের কারাবাস হয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯২৩ সালের ১৭ মে-তেই কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলায় মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ গ্রেপ্তার হয়েছিলেন।[৬] ফলে 'যুগান্তরে'র সেদিন প্রকাশিত প্যারডিটির উপর ইংরাজ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ অস্বাভাবিক নয়। তবে এরপরেও বেশ কিছুদিন অনিয়মিতভাবে পত্রিকাটি চালিয়েছেন শিবরাম।

'যুগান্তরে'র পর আরও একটি রাজনৈতিক পত্রিকা সম্পাদনার সঙ্গে শিবরাম চক্রবর্তী যুক্ত ছিলেন। ১৯২৩ সালে ২৫ সেপ্টেম্বর ৩নং রেগুলেশনে উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রেপ্তার হওয়ায় 'আত্মশক্তি'র পরিচালনার দায়িত্ব সুভাষচন্দ্র বসুর উপর ন্যস্ত হয়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ শিবরামের কথা চিঠি মারফত সুভাষচন্দ্রকে জানান। বৃদ্ধ বয়সে স্মৃতিবিভ্রমে শিবরাম জানিয়েছেন কোলকাতা কর্পোরেশনের চীফ একজিকিউটিভ অফিসার থাকাকালীনই সুভাষচন্দ্র বসু মাসিক একশ টাকায় তাঁকে 'আত্মশক্তি'র সম্পাদক নিয়োগ করেন। সুভাষচন্দ্র কোলকাতা কর্পোরেশনের চীফ্ একজিকিউটিভ অফিসার হয়েছিলেন ১৯২৪ সালের ১৪ এপ্রিল। অথচ তার পূর্ব থেকেই 'আত্মশক্তি'র সম্পাদনা করেছিলেন শিবরাম। ১৯২৪ সালের ৫ মার্চ আত্মশক্তির ৩ বর্ষ ২ সংখ্যা তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত। এমনকি বর্ষ অনুযায়ী ৩ বর্ষের প্রথম সংখ্যাটিও তাঁর সম্পাদিত হওয়ার কথা। কিন্তু পত্রিকাটিতে 'রাজবন্দি উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত তরুণ বাঙ্গালার মুখপত্র' লেখা থাকলেও সম্পাদকের নাম ছিল না। কিন্তু আবার 'Printed and Published by Sivaram Chakrabortty from the Cherry Press Ld. 93/1A, Bowbazar Street Calcutta' কথাগুলি লেখা থাকত।

'যুগান্তরে'র তুলনায় 'আত্মশক্তি' সম্পাদনায় শিবরামের অনেক বেশি সুবিধা হয়েছিল । পত্রিকাটির নিজস্ব লেখকগোষ্ঠী ছিল। কিন্তু শিবরাম নবীন লেখকদের লেখাও মর্যাদার সঙ্গে ছাপতেন। এছাড়া পত্রিকাটি পরিচালনা তথা তত্ত্বাবধানের দায়িত্বও তাঁর ছিলনা। ফলে পত্রিকা সম্পাদনার যথার্থ সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি। তাঁর সম্পাদিত 'আত্মশক্তি'তে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ,সরোজ কুমার রায়চৌধুরী, বিনয় কুমার সরকার, তারাপদ মৈত্র, প্রভাত কিরণ বসু, দিলীপ কুমার রায়, আচার্য প্রফুল্ল রায়, নজরুল ইসালাম, তারানাথ রায়, গোপাললাল সান্যাল প্রমুখেরা লিখতেন। শিবরামও বৈচিত্র্যময় সরস রচনায় কলম চালিয়েছেন। দিক্‌পতি, শস্ত্রপাণি, বিশ্বদূত প্রভৃতি ছদ্মনামে সরস রচনা, 'পাঁচমিশালী', 'খেয়ালী', 'বারোয়ারি'র মতো ফোড়ন কাটা সরস চুটকিধর্মী অম্লমধুর ফিচারগুলি তাঁরই মস্তিষ্ক প্রসূত। শিবরামের ভাষায় —

"বাইরের থেকে যা দু-চারটে লেখা আসত, দেখে শুনে দেওয়া হত, কিন্তু বাকিটা সবই, স্বনামে, বেনামে, ছদ্মনামে বিবিধ ফিচারে লিখে ভরাট করতাম আমি।"[৭] এইভাবে শিবরামের সরস লেখাগুলির খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল মূলত পত্রিকা সম্পাদনার সূত্রে। এই পত্রিকায় শিবরামের একাধিক কবিতাও প্রকাশিত হয়েছে। যেমন 'দক্ষিণ হাওয়া' (৩য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা) ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "খেয়া"র (১৯০৬) 'অনাবশ্যক' কবিতার অনুসরণে 'অকারণ' কবিতা।

'আত্মশক্তি' সুসম্পাদনার জন্য সুভাষচন্দ্র বসু শিবরামকে পুরস্কৃতও করেছিলেন।[৮] কিন্তু মাসকয়েক পরেই সুভাষচন্দ্রই অফিসে গরহাজির থাকার কারণে 'আপনাকে আমাদের আর দরকার নেই' বলে চিরকুট পাঠিয়ে শিবরামকে সম্পাদনার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেন।[৯] 'আত্মশক্তি' পত্রিকাই মে ১৯২৯ (বৈশাখ ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ) 'নবশক্তি' রূপে আত্মপ্রকাশ করে। 'নবশক্তি' পত্রিকার সম্পাদনার সঙ্গেও একসময় শিবরাম যুক্ত ছিলেন।[১০] এছাড়াও তিনি চেতলা থেকে প্রকাশিত 'ভারত জ্যোতি' পত্রিকার সম্পাদনার সঙ্গে ১৯৫৯ সাল থেকে পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন।[১১] কিন্তু শিবরাম মূলত নবপর্যায় 'যুগান্তর' ও 'আত্মাশক্তি'র সম্পাদনা করেই খ্যাতি অর্জন করেন।

সাময়িক পত্রের সম্পাদক হিসাবে শিবরামের কতকগুলি বিশেষত্ব লক্ষ করা যায়।

প্রথমত, তাঁর মধ্যে সাময়িক পত্র-পত্রিকা সম্পাদনার প্রতি একটি প্রবণতা প্রথমাবধি সবিশেষ ক্রিয়াশীল ছিল। এই প্রবণতার মূলে একদিকে যেমন ছিল লেখক হওয়ার সদিচ্ছা, অন্যদিকে তেমনি ছিল সমাজের অবিচার-অনাচারের প্রতি প্রতিবাদের জেদ। নবপর্যায় 'যুগান্তর' সম্পর্কে নিজেই বলেছেন— সেকথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। 'আত্মশক্তি'তেও বিষয়টি লক্ষ করা যায়। এই পত্রিকার ৩ বর্ষ ১১ শ সংখ্যায় সম্পাদক শিবরামের 'বামুনপণ্ডিত ও হিন্দুসমাজ' লেখাটি এপ্রসঙ্গে স্মরণীয়।

দ্বিতীয়ত, উপেন্দ্রনাথের 'আত্মশক্তি'তে যেমন লেখার হাতপাকিয়েছিলেন, তেমনই নিজের পত্রিকা দুটি নবপর্যায় 'যুগান্তর' ও 'আত্মশক্তি'তে সাম্যবাদী গণচেতনাধর্মী সাহিত্যরচনায় প্রাথমিক চর্চা করেছিলেন।

তৃতীয়ত, সেই সদ্য তরুণ বয়সেই শিবরামের লেখার ভিত প্রস্তুত হয়েছিল। চুটকি রচনাকার শিবরামের আত্মপ্রকাশ নবপর্যায় 'যুগান্তরে'র পৃষ্ঠায় শুরু হয়েছিল। সেজন্য সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরীর প্রশংসাও লাভ করেছিলেন। 'আত্মশক্তি'তে একাধিক বৈচিত্র্যপূর্ণ সরস রচনা তথা ফিচারের কথা পূবেই উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তী জীবনে জনপ্রিয় একাধিক চুটকিধর্মী সরস ফিচার রচনাকার শিবরামের উন্মেষ পর্ব উক্ত দুটি পত্রিকাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল। তাঁর নিজের কথায় —

" যখন ভূণাক্ষরে ঐগুলি লিখেছিলাম তখন কিন্তু ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পেরেছি, যে, শেষ পর্যন্ত ঐ চুটকি লেখারাই আমার সব রচনার চেয়ে (পাঠকের চোখে অন্তত), চটকদার হয়ে বৈতরণী - উত্তরণের আগে পর্যন্ত তরিয়ে দেবে আমায়।"[১২]

চতুর্থত, পত্র-পত্রিকা সম্পাদনাকালে শিবরাম চক্রবর্তীর জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছিল। ফলে সেই সময়ে বুদ্ধিজীবী সাহিত্যিক মহলে তাঁর পরিচিতি স্বাভাবিক হয়ে ওঠায় পরবর্তী সময়ে লেখকরূপে আত্মপ্রতিষ্ঠায় বিশেষ সুবিধা হয়েছিল। 'আত্মশক্তি'র সম্পাদনা থেকে অপসারিত শিবরামই পরে 'আত্মশক্তি' এবং 'নবশক্তি'তে জনপ্রিয় প্রবন্ধগ্রন্থ "মস্কো বনাম পণ্ডিচেরি"র একাধিক প্রবন্ধ লিখেছেন।

পরিশেষে বলা যায় সাময়িক পত্রপত্রিকার সম্পাদক হিসাবে শিবরাম চক্রবর্তী সমসময়ের সাম্যবাদী চিন্তা ভাবনার প্রচার-প্রসারে সহায়তা করেছিলেন যেমন, তেমনই নিজের লেখকসত্তাকে সমৃদ্ধ করার সুযোগ পেয়েছিলেন।

চ) চুটকি রচনাকার শিবরাম

বাংলা সাহিত্যে জনপ্রিয়তার দিক থেকে চুটকি রচনাকার শিবরাম চক্রবর্তীর আসন শীর্ষে তা বলাই বাহুল্য । তিনিই প্রথম চুটকিকে রস-ব্যঞ্জন হিসাবে পরিবেশন করে জনপ্রিয়তার শীর্ষে তুলে ধরেন। একাধিক সাময়িক পত্রিকায় ফিচারের মাধ্যমে বিচিত্র সব চুটকি রচনা করে সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো চুটকি সাহিত্যকেও তিনি কৌলীন্য দান করেন।সাহিত্যিক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৮-১৯২৯) তাঁর "ফোয়ারা" (১৩১৭) গ্রন্থে চুটকি সাহিত্য সম্পর্কে আশা ব্যক্ত করে জানিয়েছিলেন বাংলায় প্রতিভাশালী লেখকের হাতে পড়লে এধরনের সাহিত্য 'খুলবে' ভাল। শিবরাম চক্রবর্তী হলেন সেই প্রতিভাশালী লেখক। তিনি সাহিত্য

জীবনের প্রায় অর্ধেক সময় ধরে চুটকি রচনা করে বাংলা সাহিত্যবাসরে তাকে স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

মানুষের দৈনন্দিন কথাবার্তায় চুটকির ব্যবহার থাকলেও বাংলা সাহিত্যের আসরে চুটকির প্রচলন খুব বেশি দিনের নয়। এর মূল কারণ সাহিত্য সমাজে চুটকি সম্বন্ধে প্রায় কেউই উচ্চ ধারণা পোষণ করেননি এবং এখনও পর্যন্ত চুটকি রচনা বাংলা সাহিত্যে সাহিত্যকর্ম হিসাবে তেমন উচ্চাসন লাভ করেনি। ১৩২১ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের বর্ধমান অধিবেশনে মূল সভাপতির ভাষণে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চটকদার চুটকির প্রতি সুবিচার না করে প্রশ্ন রেখেছিলেন —

"চুট্‌কীতে সময় সময় আমাদের মুগ্ধও করে, কিন্তু চুট্‌কীই আমাদের যথাসর্বস্ব হইবে? বড় জিনিস কি আর হইবে না?"[১]

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বক্তব্যের জবাবে প্রমথ চৌধুরী ১৩২২ - এর জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় 'সবুজপত্রে' 'চুট্‌কি' প্রবন্ধ লিখেছিলেন। উক্ত প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরী চুটকির প্রাচীনত্ব বিষয়ে আলোচনা করলেও তৎকালীন বাংলা সাহিত্যে চুটকির প্রচলন সম্পর্কে কিছু বলেননি। তাঁর পূর্বেই ১৩২২- এর বৈশাখে 'প্রবাসী' পত্রিকায় সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত চুটকি সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা তথা অন্তঃসারহীনতা, লঘুতা ও আকার-হ্রস্বতার দিকটিকে ইঙ্গিত করে 'অ!' কবিতায় লিখেছিলেন —

এই চট্ করে যাহা বলে ফেলা যায়
চুট্‌কি তাহারে কয়,
ওগো ছোট লেখা যত লেখে ছোটলোকে
জানিবে সুনিশ্চয়।[২]

কিন্তু প্রমথ চৌধুরী ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত উভয়েই পাঠকের সময়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চুটকি জাতীয় সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যক্ত করলেও প্রচলিত অর্থে চুটকির কথা বলেননি। তাঁরা চুটকি অর্থে রচনার আকার হ্রস্বতাকে নির্দেশ করেছেন। আবার হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অভিমতের প্রায় একই বক্তব্যের অনুরণন শোনা যায় কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষণে। শিবরাম চক্রবর্তীর 'চুটকি লেখার চটক'(আনন্দবাজার পত্রিকা, ১২ মার্চ ১৯৬১) প্রবন্ধ থেকে জানা যায় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মাদ্রাজের অখিল ভারত লেখক সম্মেলনের প্রদত্ত ভাষণে চুটকি জাতীয় সাহিত্যবিষয়ে বিরূপ মানসিকতা প্রকাশ করেছিলেন। তারই প্রতিবাদে শিবরাম উক্ত প্রবন্ধটি লিখেছিলেন। এই প্রবন্ধে শিবরাম চুটকির মূল্য ও কালজয়িতা বিষয়ে তারাশঙ্করের উত্থাপিত প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় সুদৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে চুটকি সাহিত্যের সপক্ষে কলম ধরেছিলেন। বাংলা সাহিত্যে অবহেলিত এই চুটকির প্রতি তাঁর প্রভূত আস্থা পোষণ অভিনব বটে। তাঁর কথায় —

"সাতখণ্ডের মহৎ কীর্তির মত মাথার বোঝাই করার নয়, নত হয়ে বোঝার মতন মাথায় করে বইবার না, ছোট্টকয়েকটি কথা, লোকের মুখে মুখেই ফেরে। আদরের ছোঁয়ার মতই। বই পড়ে নয়, অপরের প্রমুখাৎ তা আমরা অবগত হব। কার কথা, কে বলেছে, কবেই বা—তার কোন ঠিকানা নেইকো; যে বলবে যার সম্মুখে তার কাছে তা তখনকারই বুদবুদ—নিত্যকালের চিত্তহারী চিরন্তন। বহুকাল ব্যেপে ভলুমে ভলুমে নয়, পলে পলেই তার মালুম।

ক্রমেই সেসব চুটকি একলোক থেকে আরেক লোকে, কালে কালে লোকোত্তর স্ত্রীলোকোত্তর হতে হতে কালের পারাবার পার হয়ে যাবে।"[৩]

ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্বে চুটকি সাহিত্যের বিষয় ও আঙ্গিক সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা কেউ-ই প্রদানের প্রচেষ্টা করেননি। ললিতকুমার অনুভব করেছিলেন ফরাসী ভাষার মতো কোমলতা সরসতা ও ভাষালীলার বিচিত্রভঙ্গি যথেষ্ট পরিমাণে থাকায় বাংলা ভাষায় ঐ ভাষার মতো অতুলনীয় চুটকি রচনা সম্ভব। চুটকির স্বরূপ সম্পর্কে তাঁর অভিমত প্রথমেই স্মরণীয় —

"অতি অল্প কথায় নর চরিত্রের বা মনুষ্য জীবনের কোনও একটা জটিল তত্ত্ব সরল অথচ সরস ভাষায় প্রকাশ করাই এই প্রকারের সাহিত্যের বিশেষত্ব; একটু রসিকতা থাকিবে, কিন্তু তাহা হাল্কা হইবে না, ভাবটি গম্ভীর হইবে অথচ তাহাতে বিকট গাম্ভীর্য থাকিবে না, চাইকি একটু বিদ্রূপের কটাক্ষ থাকিবে অথবা করুণার অন্তঃসলিল প্রবাহ ধীরে বহিয়া যাইবে। এই রূপে উজ্জ্বল মধুরে মিশিলেই এই প্রকারের সাহিত্য সার্থক হয়।"[৪]

অভিধানকার হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস প্রমুখেরা চুটকির সাহিত্যগত অর্থে ললিতকুমারের অভিমতকে উল্লেখ করেছেন। "বঙ্গীয় শব্দ কোষে" চুটকি অর্থে লেখা হয়েছে —"অল্প কথায় ভাবপ্রকাশক সরল সরস ঈষদ্‌গম্ভীর ভাষার সাহিত্যবিশেষ।" জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস তাঁর "বাঙ্গালা ভাষার অভিধান"-এ চুটকি সাহিত্য বলতে 'সরল ভাষায় অতি অল্প কথায় লঘু ও সরস সাহিত্য'কে বুঝিয়েছেন। "চলন্তিকা"য় চুটকি সাহিত্য অর্থে 'তুচ্ছ লঘু চটুল সাহিত্য'কে নির্দেশ করা হয়েছে। আবার 'চটক বিশিষ্ট কিন্তু তুচ্ছ' অর্থেও চুটকির পরিচয় বিদ্যমান "বাঙ্গালা শব্দকোষ"-এ। আবার "নতুন বাঙ্গালা অভিধান"-এ চুটকি সাহিত্য বলতে 'সহজ ভাষায় খুব কম কথায় রচিত লঘু ও সরস সাহিত্য'কে বোঝানো হয়েছে। "বাংলাদেশের ব্যবহারিক বাংলা অভিধানে"ও চুটকি লেখা বা সাহিত্য বলতে 'লঘু চটুল ক্ষুদ্র ও রসাল রচনা'কে নির্দেশ করা হয়েছে। সর্বত্র চুটকির সরসতা বিষয়ে প্রায় সকলের সহমত লক্ষ করা যায়। আবার চুটকি শব্দের অন্য অর্থ পদাঙ্গুলির অলঙ্কার। পদাঙ্গুলির অলঙ্কার হিসাবে এর কৌলিন্যহীনতাও চুটকি সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিশেষ অর্থবহ।। অন্যদিকে ইংরেজি সাহিত্যে 'Joke', 'Jest', 'Anecdote' কিংবা 'Pun' প্রভৃতি রসিকতা বিষয়ক শব্দগুলির সঙ্গে স্বল্প সাদৃশ্য থকলেও কোনোটিই চুটকির সমার্থক শব্দ নয়। শিবরাম চক্রবর্তীও তাঁর নিজস্বভঙ্গিতে প্রসঙ্গ ক্রমে চুটকির স্বরূপ তুলে ধরেছেন —

''চুটল এবং চটক্‌দারি। সময়সাধ্য শ্রমসাধ্য নয়, চট্‌করে হয়, চট্‌জলদি কাম—মাথা খাটিয়ে মাথার ঘাম ফেলবার টায়ারিং কাজ না। মাথায় খাটাবার টায়রা নয়, বঙ্গবাণীর অঙ্গাভরণের জড়োয়া গয়না নয় কিছু, পদতলের চটকি মাত্র।''[৫]

সাধারণভাবে সহজ সরল এবং সরস আকর্ষণীয় লঘু রচনাই চুটকি সাহিত্য বলে বিবেচিত হয়। সেই আলোকে চুটকি রচনাকার শিবরামের আলোচনায় অগ্রসর হওয়া যেতে পারে।

নলিনীকান্ত সরকারের সম্পাদিত 'বিজলী' পত্রিকায় 'ঊনপঞ্চাশী' ও 'খড়কুটো'র দ্বারা প্রভাবিত হয়ে শিবরাম চুটকি রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন, সেকথা 'সাময়িক পত্রের সম্পাদক শিবরাম' উপ-অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'ঊনপঞ্চাশী' বাংলা চুটকি রচনার ইতিহাসে উল্লেখনীয় মাইল ফলক বিশেষ। শিবরাম মনে করেন —

''বাংলা সাহিত্যের ব্যঙ্গ রচনায় হালকা চালে গভীর কথা বলার যে ধারাটি তিনি সূত্রপাত করেছিলেন, সেখানে শুধু তিন অগ্রগণ্যই নন, অনন্য আজও।''[৬]

নবপর্যায় 'যুগান্তর', 'আত্মশক্তি' প্রভৃতি স্ব-সম্পাদিত পত্রিকায় শিবরাম স্বনামে বেনামে ছদ্মনামে বিবিধ ফিচারে অজস্র চুটকি রচনা করেছেন। এই চুটকি রচনাই তাঁকে একসময় জনপ্রিয় করে তুলেছিল। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ''দেনাপাওনা'' উপন্যাসের নাট্যরূপ ''ষোড়শী''কে কেন্দ্রকরে যে বিতর্কের সূচনা হয়েছিল তাতে শিবরামের সখেদে কথিত ও লিখিত ব্যঙ্গাত্মক চুটকি তৎকালীন বুদ্ধিজীবী-সাহিত্যিক মহলে ছড়িয়ে পড়েছিল। যেমন প্রখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্ব শিশিরকুমার ভাদুড়ীকে শিবরাম পরিহাস হরে বলেছিলেন 'শিশি-র ভাদুড়ি নহ, বোতলের তুমি'। এই এক কথার চুটকি বিতর্কের মুহূর্তে শিবরামের পরিচিতিকে জনপ্রিয় করে তুলেছিল। তাই তাঁর অকপট স্বীকারোক্তি —

''আমার গল্প নয়, কবিতা নয়, উপন্যাস নয়, শিশির ভাদুড়ির দৌলতে পাওয়া আমার সেই এককথার চুট্‌কিটাই আমায় উতরে দিয়েছে!

চুট্‌কি লেখার এই চটক।''[৭]

এই চুটকিটির জন্যই পরোক্ষভাবে শিবরাম 'দৈনিক বসুমতী'তে প্রতি রবিবার সাপ্তাহিক ফিচার 'বাঁকা চোখে' লেখার জন্য প্রাণতোষ ঘটকের আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন।

4/III/1994

179/28

Author- স্বপন কুমার [illegible]

Call no- 92.8 / স্ব / কির

~~Title Title~~ Title- [illegible]

শিবরামের সাহিত্যজীবনের প্রথম থেকেই চুটকি রচনার প্রতি সবিশেষ আকর্ষণ ছিল তা বলাই বাহুল্য। সুযোগ পেলেই তিনি চুটকি রচনায় কলম চালিয়েছেন। শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদ 'বাতায়ন' পত্রিকার সম্পাদক অবিনাশ চন্দ্র ঘোষাল 'শরৎ স্মরণে' লেখা চাইলে শিবরাম 'শরৎচন্দ্রের ভেলি' নামক একটি চুটকি কবিতা লিখেছিলেন। তাতে শরৎচন্দ্রের অতি আদরের কুকুর ভেলির সঙ্গে অবিনাশ চন্দ্রের নাম প্রকারান্তরে জড়িয়ে দিয়েছিলেন কবিতার শেষ লাইনে —

"ভেলির বিনাশ নাই', ভেলি অবিনাশ।"[৮]

শুধুমাত্র শরৎচন্দ্রের অন্তরঙ্গ অনুরাগী বলেই নয় জানা যায় অবিনাশ চন্দ্র লেখাবাবদ প্রাপ্য দক্ষিণাও ঠিকমতো না দেওয়ায় শিবরাম তাঁর প্রতি বীতশ্রদ্ধও হয়েছিলেন।

অনায়াসেই শিবরাম চুটকি লিখতে পারতেন। অশোক রক্ষিতের অনুরোধে শ্রীঘৃতের বিজ্ঞাপনের ক্যাপশন লেখার মধ্যেও তাঁর চুটকি রচনার দক্ষতা পরিলক্ষিত হয়। 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত শিবরামের সেই এক লাইনের চুটকি বিজ্ঞাপনী—

"বাজারে দু'রকমের ঘি আছে, শ্রী ও বিশ্রী - আপনি কোন্‌টা খাবেন?"[৯]

তিনিই সেই চুটকি বিজ্ঞাপনীর জন্য শ্রীঘৃতের প্রদত্ত আর্থিক পুরস্কার পেয়েছিলেন।

১৯৫০ সাল থেকে 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিক রচনা 'আপনি কী হারাইতেছেন আপনি জানেন না' অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল। হাস্যরসে ভরা এই রম্যরচনার ফিচারটি 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য়ও প্রকাশিত হয়েছিল। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ সম্পাদিত 'দৈনিক বসুমতী' পত্রিকায় সাপ্তাহিক 'বাঁকা চোখে' জনপ্রিয় চুটকির ফিচারটির কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এই 'বাঁকা চোখে'র মাধ্যমেই শিবরাম যথার্থ অর্থে চুটকি রচনার স্বতন্ত্র ধারায় মনোনিবেশ করেছেন। নিজেও জানিয়েছেন টুকরো সংবাদের উপর টিপ্পনি সংযুক্ত করে বৈচিত্র্যময় সরস চুটকি প্রণয়ন করেছেন। তিনি আরও জানিয়েছেন "বসুমতীর বাঁকা চোখের মত চুটকি লেখার কাজই আমার পোষায়।"[১০]

চুটকিগুলিতে শিবরামের রসিকতায় ব্যঙ্গও সমুজ্জ্বল। যেমন —

"জম্মু ও কাশ্মীর সমস্যার তাপে ক্লিষ্টদেশ দুর্ভিক্ষ ও কুশাসনের সম্মুখে দণ্ডায়মান।"

- ড. শ্যামাপ্রসাদ

উপবিষ্ট বলুন। মোক্ষলাভের জন্য কুশাসনই তো চাই।

আবার অনেক সময় শিবরামের সংযোজিত মন্তব্য অত্যন্ত অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছে —

কম্যুনিষ্ট পার্টি ছেড়ে দেওয়ার জন্য এম. এন. রায় রাশিয়া থেকে যে মাসোহারা পেতেন সেটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

— এম. এন. রায়ের মাসিক বন্ধ।

'বাঁকা চোখে' নামকরণের মধ্যেই ফিচারের চুটকিগুলির প্রকৃতি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। হাস্যরস সৃষ্টির জন্য কোনো বিষয়কে তির্যকভাবে দেখার কথা শিবরাম নিজেই বলেছেন। চুটকিগুলির ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। 'বাঁকা চোখে'র পরবর্তী সময়ে লেখা চুটকিগুলিও বাঁকা ভাবে তথা তির্যক ভাবে দেখা কোনো বিষয়ের সরস উপস্থাপন লক্ষ করা যায়।

১৯৬৩ সালের ৫ এপ্রিল থেকে ১৯৬৯ সালের ১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রায় আট বছর ধরে শিবরাম 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় 'বাঁকা চোখে'র অনুরূপ 'বিসংবাদ' শিরোনামে প্রতি শনিবারে চুটকির ফিচার লিখতেন। চুটকিগুলি আসলে নিজস্ব ভাষায় টুকরো সংবাদের সঙ্গে অল্পমধুর টিপ্পনি সমন্বিত বিশেষ সংবাদ। যেমন —

শ্রী পাতিল শ্রীমতী গান্ধীর নবীন সংগঠনকে মারকসিস্ট কংগ্রেস আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু ফুল মারকস্ কি শ্রীমতীর দলকে দেওয়া চলে?

—বড় জোর পাস মারকই দেওয়া চলে।

আবার 'বিসংবাদে'র চুটকির মধ্যেই সমাজ সচেতক সিরিয়াস শিবরামের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন ,

'চক্ষুদান' কে নিয়ে লেখা একটি চুটকিতে একদিকে চক্ষুদান-ভীতু মানুষদের ব্যঙ্গ করেছেন, অন্যদিকে তৎকালীন সরকারেরও সমালোচনা করেছেন —

পাছে পরজন্মে কানা হয়ে জন্মাতে হয় সেই ভয়েই কিনা কে জানে, এ-দেশে অন্তিমকালেও কেউ তার চক্ষুরত্ন দান করে যায় না। বাধ্য হয়ে এ-দেশের অন্ধদের দৃষ্টিশক্তি দানের জন্য বিদেশী আই ব্যাঙ্ক থেকে করনিয়া আমদানী করতে হয়—কিন্তু সেজন্যে যে বিদেশী মুদ্রা লাগে তা ব্যয় করতে

সরকার বাহাদুর ভারী নারাজ ! স্বভাবতই, বলা বাহুল্য, চক্ষুদান করতে যদি টাকা লাগে, তবে টাকাটার চক্ষুদান তাঁরাই করবেন। তাঁদের বিদেশে যাতায়াতের কি খরচা নেই ?

১৯৫৭ সালের ২৫ মে থেকে শিবরামের সাড়াজাগানো চুটকির ফিচার 'অল্পবিস্তর' রবিবাসরীয় 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত হতে থাকে। হাস্যরসিক শিবরাম 'অল্পবিস্তরে'র চুটকিগুলোর জন্য সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন। ১৯৭৪ সালে ২ নভেম্বর পর্যন্ত দীর্ঘ সতেরো বছরের অধিক সময় ধরে তিনি চুটকির ফিচারটি লিখেছিলেন। জীবনের অন্তিম পর্যায়ে হাসির গল্পের শিব্রাম 'অল্পবিস্তরে'র চুটকি রচনা করে যেমন পরিতৃপ্তি পেয়েছিলেন, তেমনই জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠেছিলেন। উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিজলী'তে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত পলিটিক্যাল রসরচনার দ্বারা প্রভাবিত হয়েই শিবরাম 'অল্পবিস্তর' ফিচারটি লিখেছিলেন সেকথা 'সাময়িক পত্রের সম্পাদক শিবরাম' উপ-অধ্যায় উল্লেখ করা হয়েছে। লেখা অল্প—কিন্তু পড়া বিস্তর নিয়েই তাঁর অল্পবিস্তর বলে তিনি জানিয়েছেন। অত্যন্ত জনপ্রিয়তার জন্য আনন্দবাজার পত্রিকার পর ১৯৭৪ সালের ১৩ জুলাই থেকে 'দেশ' পত্রিকায়ও 'অল্পবিস্তর' ফিচার লিখেছিলেন শিবরাম। এক বছর ধরে ফিচারটি চলেও ছিল।

নানাস্বাদের বৈচিত্র্যময় চুটকির সমাহার 'অল্পবিস্তরে' লক্ষ করা যায়।
যেমন পাঠকের প্রেরিত চিঠির উত্তর সংযোগ করে লেখা চুটকি —

শ্রী গদাই চাঁদ দে ঃ 'মনের মত বৌ নাহলে কী করা যায় বলুন তো' ?
বৌয়ের মতন মন করে নিতে হয় বোধ হয়?

প্রশ্ন-উত্তরে লেখা চুটকি —

কর্তা ঃ লিলির বিয়ের এখন কি ? যথেষ্ট সময় আছে। যদ্দিন উপযুক্ত পাত্র না আসে, অপেক্ষা করুক না !

গিন্নি ঃ কেন সে অ্যাদ্দিন অপেক্ষা করবে শুনি ? কই, উপযুক্ত পাত্রের জন্য আমি ত তা করিনি।

অতি অল্পকথায় গল্পাকারে চুটকি —

এই আংটিটা কি সুন্দর দ্যাখ ভাই ! অনিল দিয়েছে আমায়। ছবি বললো কবিতাকে। 'আমার আঙুলে মানিয়েছে এমন !'
মানিয়েছে সত্যি। কিন্তু কি করব, আমার কোনো আঙুলেই যে এটা ঢুকলো না।'

শিব্রামের হাসির গল্পের বিখ্যাত ভ্রাতৃদ্বয় হর্ষবর্ধন ও গোবর্ধনের কথোপকথনে সৃষ্ট চুটকি —

'লোকটা অমন মজা করে রসিয়ে গোপাল ভাঁড়ের গল্প বলল। সভাসুদ্ধ সবাই হাসল আর তুই কিনা গোমড়ামুখো হয়ে বসে থাকলি ?' হর্ষবর্ধন জিজ্ঞেস করলেন গোবর্ধনকে।

'মজার গল্প ঠিকই।' জবাব দিল গোবরা, 'কিন্তু ঐ লোকটাকে দু'চোখে দেখতে পারিনা। তাই আমি হাসলাম না; বাড়ী গিয়ে হাসব।'

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লক্ষ করা যায় দৈনিক সংবাদ পত্রে প্রকাশিত চুটকিধর্মী ফিচারগুলি রাজনৈতিক বিষয়কে কেন্দ্র করে লেখা। শিবরামের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। রাজনৈতিক সংবাদের উপর ভিত্তি করে লেখা চুটকি—

কেবল ক্রিকেট তারকাই নয় এবার চিত্র তারকারাও নির্বাচনী রঙ্গমঞ্চে নামবেন বলে প্রকাশ।

- কী সর্বনাশ। সত্যিকার অভিনেতাদের সঙ্গে দেশপ্রেমিকের ভূমিকাভিনয়ে নকল (অভি) নেতারা পেরে উঠবেন কি?

শিব্রামীয় রসিকতার চুটকি —

বিয়ের আগে মেয়েরা থাকে মিস্টি, বিয়ের পর আগের মিস্ট্রি (Mystry) হিস্ট্রি (History) আছে বলে শোনা যায়।

- মিস্টিরিয়াস হিস্টিরিয়াও কোন কোন ক্ষেত্রে বোধ করি?

শিবরাম 'অল্পবিস্তরে'র চুটকিগুলি লেখার জন্য প্রয়োজনে অপরের সহযোগিতা নিয়েছিলেন।[১১] তবে সহযোগিতা বলতে চুটকির সূত্রটিই, পরিবেশন তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব বিষয়। হাস্যরসিক শিব্রামেরই রসিকতারই অন্য একটি জনপ্রিয় মাধ্যম তাঁর উপাদেয় চুটকি। বাংলার গোপালভাঁড়, মোল্লা নাসিরুদ্দিন কিংবা বীরবলের সরস চুটকিধর্মী গল্পকথার মতোই শিবরামের চুটকিগুলি আজও জনপ্রিয়। তাঁর মৃত্যুর বেশ কয়েক বছর পরেও বাজারে একাধিক চুটকির বই প্রচলিত রয়েছে। যেমন 'রসেভরা রসিকতা,' 'অল্পবিস্তর', দেবাশীষ চাকী সম্পাদিত 'শিবরাম জোকস' প্রভৃতি।

অনেক সময় শিবরামের চুটকিতে আধুনিক সমাজের সিরিয়াস বিষয়ের অবতারণা লক্ষ করা যায়।

চুটকি যে শুধু মাত্র হাস্যরসের উপকরণ মাত্র নয়, তা সহজেই অনুমান করা যায় ঐ সমস্ত সমাজ সচেতনতামূলক চুটকিগুলি উপলব্ধি করলে। প্রসঙ্গক্রমে শিবরাম জানিয়েছেন —

"কথার ফাঁকি বলে মনে হলেও, ছোট্ট এক টুকরো কথার ফাঁকেই বহুৎ কারুকর্ম থাকতে পারে, প্রচুর ভূয়োদর্শন।"[১২]

তাঁর চুটকির একটুকরো কথায় হাস্যরসের আধারে সিরিয়াস কথা বলার প্রচেষ্টা বর্তমান। যেমন —

মন্টু দিদিমার কাছে এসে সাধছিল—'দিদিমা, তুমি ব্যাঙের মত ডাকতে পারো, ডাকো না একটুখানি।'

'কেন বল তো দাদু।'

'এই ব্যাঙরা যেমন ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ করে ডাকে, তেমনি করে ডাকো না একবারটি।'

'ডাকলে কী হবে দাদুমণি?'

'ভারি মজা হবে। আমরা অনেক টাকা পাব। বাবা বলেছিলেন, তোর দিদিমার যেদিন গলা ঘড়ঘড় করবে সেদিন তোরা অনেক টাকা পাবি।'

কিংবা, —

'ট্যাকসি ! ইধার আও।'

ট্যাকসিওয়ালা ট্যাকসি নিয়ে এল। ভদ্রলোক উঠলেন তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে। ট্যাকসিওয়ালাকে হুকুম করলেন প্রসূতি সদনে যাবার জন্য। ট্যাকসিওয়ালা দ্বিগুণ ভাড়া হেঁকে বসল।

ভদ্রলোক বললেন — 'ডাবল ভাড়া দেব কেন ? আমার স্ত্রী রোগিনী নন, তিনি সেখানকার নার্স।'

সরস বুদ্ধিদীপ্ত অল্পমধুর টিকা-টিপ্পনী সংবলিত, শব্দের নিপুণ খেলায় ও বৈচিত্র্যময় ঘটনা সংস্থাপনে উপাদেয় চুটকিগুলি শিবরামের সাহিত্য সৃষ্টির অনন্য ফসল হিসাবে পরিগণ্য হয়। চুটকি রচনার জন্য তিনি

শুধু নিজেই জনপ্রিয় হননি, একাধিক সাহিত্যিককে প্রথম প্রচারের আলোয় নিয়ে এসেছেন। একালের একজন প্রতিষ্ঠিত রসসাহিত্যিক তারাপদ রায় অকপটে স্বীকার করেছেন —

"অল্পবিস্তরই আমাকে প্রথম খ্যাতির স্বাদ দিয়েছিল। শিবরাম চক্রবর্তী আমার মহাগুরু। তাঁরই হাত ধরে বাংলাসাহিত্যের প্রাসাদের সরস মিষ্টান্নের ভাঁড়ার - ঘরে প্রবেশ করেছিলাম।"[১৩]

আবার সাহিত্যিক দেবাঞ্জন চক্রবর্তীও জানিয়েছেন —

"এই অল্প বিস্তরের পাঠানো চুটকির সুবাদেই প্রথম আনন্দবাজার পত্রিকায় আমার নাম প্রকাশিত হয়।"[১৪]

পরিশেষে চুটকিপ্রিয় শিবরামের অভিমত স্মরণীয়। তাঁর মতে —

"এপিক উপন্যাসের সাত ভলুম জুড়ে যে কথাটা বলা হয়েছে, কয়েকটা বাক্যেও তা বলা যায়। যে বলতে পারে সে ওস্তাদ—তার কেরামতিকে সেলাম।"[১৫]

'সে ওস্তাদ' শিবরাম নিজেই। তার প্রমাণ তাঁর চুটকি সাহিত্য। বাংলা চুটকি সাহিত্যের ক্রমবিকাশে একজন সার্থক দিশারী সাহিত্যিক । শুধুমাত্র চুটকি রচনা করেই একাধিক ফিচার জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন নিপুণ মুন্সীয়ানায়। চুটকির প্রচার, প্রসার এবং আকর্ষণীয় পরিবেশন করে উপাদেয় করার সকল কৃতিত্বই রসসাহিত্যিক শিবরাম চক্রবর্তীর—এবিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই। সেখানেই চুটকি রচনাকার শিবরাম চক্রবর্তীর সার্থকতা নিহিত রয়েছে।

তথ্যসূত্র নির্দেশিকা

কবি শিবরাম

১। বিস্মৃত এক মানুষের কবি (প্রবন্ধ), কৃষ্ণ ধর, কোরক সাহিত্য পত্রিকা বইমেলা - ১৯৯০,পৃষ্ঠা -৮৬

২। কল্লোল যুগ, অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত, এম সি. সরকার অ্যান্ড সন্স, কোলকাতা, পঞ্চম প্রকাশ বৈশাখ ১৩৭২ ,পৃষ্ঠা - ২৬০

৩। ভারতী ঃ ইতিহাস ও রচনাপঞ্জী, সুনীলদাস, সাহিত্যলোক, কোলকাতা, প্রথম প্রকাশ কার্তিক ১৩৯১, অক্টোবর ১৯৮৪, পৃষ্ঠা - ৩০১

৪। ঈশ্বর পৃথিবী ভালবাসা, শিবরাম চক্রবর্তী, নবপত্র প্রকাশন, কোলকাতা, প্রথম নবপত্র প্রকাশ ১ বৈশাখ ১৪০১, পৃষ্ঠা - ১৫৪, ১৩০

৫। তদেব, পৃষ্ঠা -১৪৯-১৫০

৬। তদেব, পৃষ্ঠা - ১৫০

৭। তদেব, পৃষ্ঠা - ১৫০

৮। ভালবাসা পৃথিবী ঈশ্বর, শিবরাম চক্রবর্তী, নবপত্র প্রকাশন , কোলকাতা, প্রথম প্রকাশ কোলকাতা পুস্তক মেলা ৩১ জানুয়ারি ১৯৯৬, পৃষ্ঠা - ২১৩-২১৪

৯। পূর্বোক্ত ৪ নং , পৃষ্ঠা - ৩৫১-৩৫২

১০। তদেব, পৃষ্ঠা - ৩৭৬-৩৭৭

১১। পূর্বোক্ত ৪ নং, পৃষ্ঠা - ৩৭৭

১২। রবীন্দ্রনাথকে কৌতুক, সুব্রত রুদ্র সম্পাদিত, পরিবেশক নাথ ব্রাদার্স, কোলকাতা, প্রথক প্রকাশ ২৫ বৈশাখ ১৩৯৩, পৃষ্ঠা - ৬২

১৩। পূর্বোক্ত ৮ নং, পৃষ্ঠা - ৩২

১৪। তদেব, পৃষ্ঠা - ৩২

১৫। চুম্বন ও শিবরাম (প্রবন্ধ), একাকী গড়াই, ষষ্টি-মধু ,শিব্রাম শ্রদ্ধার্ঘ বর্ষগুরু, ১৩৮৮, পৃষ্ঠা - ৭৭

১৬। হকার কবি শিবরাম (প্রবন্ধ), নলিনীকান্ত সরকার, ষষ্টি-মধু'রপূর্বোক্ত ১৫ নং সংখ্যা, পৃষ্ঠা - ৯

১৭। পূর্বোক্ত ৪ নং , পৃষ্ঠা - ১৫৪

১৮। তদেব, পৃষ্ঠা - ২০১

১৯। তদেব, পৃষ্ঠা - ১৫৪

২০। তদেব, পৃষ্ঠা - ১৫৪

২১। তদেব, পৃষ্ঠা - ১৫৪

২২। পূর্বোক্ত ১ নং , পৃষ্ঠা -৮৬

২৩। মানুষ - এর শিবরাম (প্রবন্ধ), কমল কুমার দত্ত, ষষ্টি-মধুর পূর্বোক্ত ১৫ নং সংখ্যা, পৃষ্ঠা-৪২

২৪। শিবরামের হাসির কবিতা (প্রবন্ধ), মানস মজুমদার 'ষষ্টি-মধু' পূর্বোক্ত ১৫ নং সংখ্যা, পৃষ্ঠা - ৮৫

২৫। চিঠিটি শিবরামের "ছেলে বয়সে" (১৩৩২) উপন্যাসের 'পরিচয়' অংশের সঙ্গে ছাপা হয়েছিল।

প্রাবন্ধিক শিবরাম

১। অক্টোবর বিপ্লব ও আধুনিক বাংলা সাহিত্য, মলয় বসু, কে পি বাগচী এন্ড কোম্পানী, কোলকাতা প্রথম প্রকাশ১৯৮৯, পৃষ্ঠা ১৫৬-১৮০

২। ঈশ্বর পৃথিবী ভালবাসা, শিবরাম চক্রবর্তী , নবপত্র প্রকাশন, কোলকাতা ,প্রথম নবপত্র প্রকাশ ১লা বৈশাখ ১৪০১ পৃষ্ঠা-৩৫১-৩৫২

৩। তাহাদের সবার সমান, শিবরাম চক্রবর্তী, আত্মশক্তি ৩ বর্ষ, ৩ সংখ্যা, ১৯২৮

৪। পূর্বোক্ত ২ নং পৃষ্ঠা - ৩৫৬

৫। আত্মশক্তি, ৩য় বর্ষ ১১শ সংখ্যা

৬। পূর্বোক্ত ১ নং, পৃষ্ঠা - ১৬৩, আত্মশক্তি - ৩০.৮.১৯২২

৭। পূর্বোক্ত ১ নং, পৃষ্ঠা - ১৬৭

৮। আত্মশক্তি ১ জানুয়ারি ১৯২৯

৯। শিল্পীর স্বাধীনতা, মস্কো বনাম পণ্ডিচেরি, গ্রন্থলোক, কোলকাতা, শ্রাবণ ১৩৭২, পৃষ্ঠা - ১৪০

১০। মস্কো বনাম পণ্ডিচেরি, শিব্রাম অমনিবাস ৪, শিবরাম চক্রবর্তী, নবপত্র প্রকাশন, কোলকাতা প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৪, ভূমিকা

১১। ভারতী'র ১৩৩৩ - এর আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত,

১২। কোরক সাহিত্য পত্রিকা, প্রাক্ শারদ ১৪১০, পৃষ্ঠা - ৩৯

১৩। শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকা ১৩৭৬

১৪। বিভাজন শিবরামেরই কৃত। 'মস্কো বনাম পণ্ডিচেরি'র নতুন সংস্করণের ভূমিকায়

১৫। শিবরামের জীবনদর্শন, ভূপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, যষ্টি-মধু, শিব্রাম শ্রদ্ধার্ঘ বর্ষ শুরু, ১৩৮৮, পৃষ্ঠা - ৭১-৭২

১৬। মস্কো বনাম পণ্ডিচেরী, অশোক মিত্র, কোরক সাহিত্য পত্রিকা, বইমেলা, ১৯৯০, পৃষ্ঠা - ৮

১৭। শিল্পীর স্বাধীনতা (প্রবন্ধ), শিবরাম চক্রবর্তী গল্পমেলা বার্ষিক সংকলন ২০০৩, শতবর্ষে শিবরাম শ্রদ্ধার্ঘ, পৃষ্ঠা - ১১৩

১৮। শিবরাম চক্রবর্তী, 'মস্কো বনাম পণ্ডিচেরী' (প্রবন্ধ), পূর্বোক্ত ১২ নং পত্রিকা, পৃষ্ঠা - ১১

১৯। পূর্বোক্ত ১৬ নং, পৃষ্ঠা - ৮

২০। পূর্বোক্ত ১৭ নং, পৃষ্ঠা - ১১৩-১১৪

২১। মস্কো বনাম পণ্ডিচেরি, শিবরাম চক্রবর্তী, ক্যালকাটা বুক ক্লাব, কোলকাতা, নতুন সংস্করণ ১৩৫৯, ভূমিকা

২২। বিজ্ঞানের সার্থকতা, শিব্রাম অমনিবাস ৪, শিবরাম চক্রবর্তী, নবপত্র প্রকাশন, কোলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুযারি ১৯৯৪, পৃষ্ঠা - ১৪৬

২৩। শিব্রাম অমনিবাস ৪, শিবরাম চক্রবর্তী, নবপত্র প্রকাশন, কোলকাতা, পৃষ্ঠা - ১১০-১১১, ১১৩-১১৪

২৪। কবি জয়ন্তী, শিব্রাম অমনিবাস ৪, শিবরাম চক্রবর্তী, নবপত্র প্রকাশন, কোলকাতা, পৃষ্ঠা - ১২৪

২৫। তদেব, পৃষ্ঠা - ১২৪-১২৫

২৬। পূর্বোক্ত ২১ নং

২৭। সঙ্ঘ মানেই সাঙ্ঘাতিক, শিব্রাম অমনিবাস ৪, শিবরাম চক্রবর্তী, নবপত্র প্রকাশন, কোলকাতা, পৃষ্ঠা - ১৩৩

২৮। হরিজন আন্দোলনের নবদর্শন, শিব্রাম অমনিবাস ৪, শিবরাম চক্রবর্তী, নবপত্র প্রকাশন, কোলকাতা, পৃষ্ঠা - ১৩৫,১৩৬,১৩৭

২৯। 'শূদ্র না ব্রাহ্মণ?', শিব্রাম অমনিবাস ৪, শিবরাম চক্রবর্তী, নবপত্র প্রকাশন, কোলকাতা, পৃষ্ঠা - ১৪১,১৪২

৩০। আধুনিক নাটক, শিব্রাম অমনিবাস ১২, শিবরাম চক্রবর্তী, নবপত্র প্রকাশন, কোলকাতা, পৃষ্ঠা - ১৪১,১৪৩,১৪৪

৩১। আনন্দবাজার পত্রিকা, শনিবার ৩০ নভেম্বর ২০০২, পৃষ্ঠা - দশ

৩২। পূর্বোক্ত ২ নং, পৃষ্ঠা - ১৬৩

৩৩। পূর্বোক্ত ১৬ নং পত্রিকা, পৃষ্ঠা - ৫

৩৪। সাহিত্যে অভিনবত্ব, শিব্রাম অমনিবাস ১২, শিবরাম চক্রবর্তী, নবপত্র প্রকাশন, কোলকাতা, পৃষ্ঠা - ১৩৮

৩৫। পূর্বোক্ত ৩০ নং , পৃষ্ঠা - ১৪৫

৩৬। তদেব, পৃষ্ঠা - ১৪৫

৩৭। পাঠকের মধ্যে ভেজাল, শিব্রাম অমনিবাস ১২, শিবরাম চক্রবর্তী, নবপত্র প্রকাশন, কোলকাতা, পৃষ্ঠা - ১৫৩

৩৮। হাসির গল্প হাসিল করা, পূর্বোক্ত ৯ নং , পৃষ্ঠা - ১৩৮

৩৯। হাসির গল্পের আঙ্গিক, শিব্রাম অমনিবাস ১২, শিবরাম চক্রবর্তী, নবপত্র প্রকাশন, কোলকাতা, পৃষ্ঠা - ১৫০

৪০। কিশোরদের জন্য সাহিত্য, পূর্বোক্ত ৯ নং , পৃষ্ঠা - ১৩১-১৩২

৪১। আনন্দসঙ্গী ১ প্রবন্ধ, আনন্দ বাজার পত্রিকা সংকলন ১৩২৮-১৮০৩, পৃষ্ঠা - ১৫১

৪২। পূর্বোক্ত ৩০ নং , পৃষ্ঠা - ১৩৫,১৩১

৪৩। পূর্বোক্ত ১২ নং , পৃষ্ঠা - ১৬০

৪৪। গল্পমেলা বার্ষিক সংকলন ২০০৩, পৃষ্ঠা - ১১৪-১১৫

৪৫। মস্কো বনাম পণ্ডিচেরি ঃ আজ ও আগামীকালের সংলাপ (প্রবন্ধ), পূর্বোক্ত ৪৪ নং, পৃষ্ঠা - ২৫

৪৬। পূর্বোক্ত ৪৪ নং, পৃষ্ঠা - ১১৫

৪৭। তদেব, পৃষ্ঠা - ১১৬

৪৮। এস্টাবলিশমেন্ট-বিরোধিতা এবং শিবরাম চক্রবর্তী (প্রবন্ধ), চতুষ্কোণ, শারদীয় ১৪১০, পৃষ্ঠা - ৪৭-৪৮

৪৯। পূর্বোক্ত ১ নং, পৃষ্ঠা - ১৭১

৫০। পূর্বোক্ত ১৬ নং, পৃষ্ঠা - ৮

৫১। পূর্বোক্ত ১৫ নং পৃষ্ঠা ৭৪

নাট্যকার শিবরাম

১। ইবসেন ও বাংলা নাটক, ডঃ নরেশ চন্দ্র খাঁ, পুস্তক বিপণি, কোলকাতা, প্রথম প্রকাশ ৩০ আগস্ট ১৯৮৬, ভূমিকায়

২। তদেব, নিবেদন অংশ

৩। তদেব, পৃষ্ঠা - ১

৪। ঈশ্বর পৃথিরী ভালবাসা, শিবরাম চক্রবর্তী, নবপত্র প্রকাশন, কোলকাতা, প্রথম নবপত্র প্রকাশ ১ বৈশাখ ১৪০১ পৃষ্ঠা - ১৩৪

৫। শরৎচন্দ্রের জীবন-রহস্য, শ্রী সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, শিশির পাবলিশিং হাউস, কোলকাতা, প্রকাশকাল উল্লেখ নেই, পৃষ্ঠা - ১৫১

৬। পূর্বোক্ত ৪ নং, পৃষ্ঠা ১৩৫

৭। চাকার নীচে, শিব্রাম অমনিবাস ১১, শিবরাম চক্রবর্তী, নবপত্র প্রকাশন, কোলকাতা, প্রথম প্রকাশ জুন ১৯৯৭, পৃষ্ঠা - ১৬৬

৮। তদেব, পৃষ্ঠা - ২০৮

৯। তদেব, পৃষ্ঠা - ১৮৫

১০। তদেব, পৃষ্ঠা - ১৯১

১১। তদেব, পৃষ্ঠা - ১৯৪-১৯৫

১২। তদেব, পৃষ্ঠা - ১৯৮

১৩। তদেব, পৃষ্ঠা - ১৮৩

১৪। তদেব, পৃষ্ঠা - ২০৭

১৫। তদেব, পৃষ্ঠা - ২০৮

১৬। পূর্বোক্ত ৪ নং, পৃষ্ঠা - ১৩৫

১৭। বাংলা একাঙ্ক নাটকের উদ্ভব, প্রকৃতি ও বিকাশ, ড. কৃষ্ণলাল ভট্টাচার্য, প্রধান পরিবেশক নবগ্রন্থ কুটির, কোলকাতা, প্রথম প্রকাশ মহালয়া ১৩৯৫, পৃষ্ঠা - ২২৭

১৮। শিব্রাম অমনিবাস ১২, শিবরাম চক্রবর্তী, নবপত্র প্রকাশন, কোলকাতা, ডিসেম্বর ১৯৯৭, পৃষ্ঠা - ১৪১

১৯। তদেব পৃষ্ঠা - ১৪৩

২০। তদেব, পৃষ্ঠা - ১৪৪

২১। মন্মথ রায়ের গ্রন্থাবলী, বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, কোলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ১লা বৈশাখ ১৩৯১, 'বাংলা একাঙ্ক নাটকের সুবর্ণ জয়ন্তী ১৯৭৩' অংশ

২২। চলন্তিকা, আষাঢ় ১৩৫৬

২৩। শিব্রাম অমনিবাস ১০, শিবরাম চক্রবর্তী, নবপত্র প্রকাশন, কোলকাতা, পৃষ্ঠা - ১৭৪ - ১৭৫

২৪। তদেব, পৃষ্ঠা - ১৯৭

২৫। কল্লোল যুগ, অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, কোলকাতা, পঞ্চম প্রকাশ বৈশাখ ১৩৭২, পৃষ্ঠা - ১৭২

২৬। পূর্বোক্ত ২৩ নং, পৃষ্ঠা - ১৮৬

২৭। পূর্বোক্ত ১৭ নং, পৃষ্ঠা - ২২৭, ২২৮

২৮। শিব্রাম রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, সম্পাদনা শিবরাম চক্রবর্তী, পুনশ্চ, কোলকাতা, নভেম্বর ১৯৯৯, ভূমিকা

২৯। 'প্রাবন্ধিক শিবরাম' উপ-অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে

৩০। শিবরাম চক্রবর্তী এবং বাংলা নাটক, বারিদবরণ ঘোষ, কোরক সাহিত্য পত্রিকা, প্রাক্ শারদ ১৪১০, পৃষ্ঠা - ৪৪

গল্পকার শিবরাম

১। কল্লোল যুগের ছোটগল্প ও রুশবিপ্লব ,ড. শিবশংকর পাল, পাণ্ডুলিপি, কোলকাতা, কোলকাতা বইমেলা ১৯৯৯, পৃষ্ঠা - ১

২। কল্লোল প্রেক্ষিত ও ছোটগল্প, বীরেন্দ্র দত্ত, পুস্তক বিপণি, কোলকাতা, ১৫ এপ্রিল ২০০১, পৃষ্ঠা-৯৭

৩। বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার, শ্রী ভূদেব চৌধুরী, মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কোলকাতা, পুনর্মুদ্রণ ১৯৯৯, পৃষ্ঠা - ৫৩১

৪। কল্লোল যুগ, অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত, এম.সি.সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃলিঃ, কোলকাতা, পঞ্চম প্রকাশ, বৈশাখ ১৩৭২, পৃষ্ঠা - ১১৬

৫। শিবরামকে যেমন দেখছি (প্রবন্ধ), গল্পমেলা বার্ষিক সংকলন ২০০৩, পৃষ্ঠা - ৪৯

৬। আমার কাল আমার দেশ, সুধীরচন্দ্র সরকার, এম.সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্‌স প্রাঃলিঃ, কোলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ আষাঢ় ১৪০১, পৃষ্ঠা - ১৩১

৭। তদেব, পৃষ্ঠা - ১৩২, গল্পগ্রন্থ 'পঞ্চাননের অশ্বমেধ' ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত হয়।

৮। ভালবাসা পৃথিবী ঈশ্বর, শিবরাম চক্রবর্তী, নবপত্র প্রকাশন, কোলকাতা, ৩১ জানুয়ারি ১৯৯৬, পৃষ্ঠা-৩২-৩৩

৯। শিব্রাম রচনাবলী, প্রথমখণ্ড, শিবরাম চক্রবর্তী (সম্পাদিত), পুনশ্চ, কোলকাতা, ভূমিকা

১০। পূর্বোক্ত ৫ নং পত্রিকা, পৃষ্ঠা - ১৪

১১। গল্প লেখার গল্প, জ্যোতিপ্রসাদ বসু (সম্পাদিত), বেঙ্গল পাবলিশার্স, কোলকাতা, শ্রাবণ ১৩৫৩

১২। ঈশ্বর পৃথিবী ভালবাসা, শিবরাম চক্রবর্তী, নবপত্র প্রকাশন, কোলকাতা, ১লা বৈশাখ ১৪০১, পৃষ্ঠা - ২২৩

১৩। হাসির গল্প হাসিল করা (প্রবন্ধ), মস্কো বনাম পণ্ডিচেরি, শিবরাম চক্রবর্তী, গ্রন্থলোক, শ্রাবণ ১৩৭২, পৃষ্ঠা -১৩৬

১৪। শিবরাম চক্রবর্তীর স্বনির্বাচিত গল্প, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোঃ লিঃ, কোলকাতা, প্রথম সংস্করণ ৭ বৈশাখ ১৩৬৩, ভূমিকা

১৫। হাসির গল্পের আঙ্গিক,শিব্রাম অমনিবাস ১২, শিবরাম চক্রবর্তী, নবপত্র প্রকাশন, ডিসেম্বর ১৯৯৭, পৃষ্ঠা - ১৫০

১৬। পূর্বোক্ত ১৪ নং, ভূমিকা

১৭। পূর্বোক্ত ৩ নং, পৃষ্ঠা - ৫৩২

১৮। পূর্বোক্ত ১৪ নং, ভূমিকা

১৯। পূর্বোক্ত ১২ নং, পৃষ্ঠা - ৩৪৪

২০। কবি-জয়ন্তী, শিব্রাম অমনিবাস ৪, শিবরাম চক্রবর্তী, নবপত্র প্রকাশন, জানুয়ারি ১৯৯৫, পৃষ্ঠা - ১২৪

২১। গল্পটিকে শিবরাম চক্রবর্তীর 'আমার লেখা' গ্রন্থে রসরচনা বলে সূচিপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু তা যে রসরচনা নয়, গল্পই, অপর দুটি গল্পের প্রতিতুলনায় সহজেই অনুমেয়।

সাময়িক পত্রের সম্পাদক শিবরাম

১। ব্রিটিশ শাসনে বাজেয়াপ্ত বাংলা বই, শিশির কর, আনন্দ পাবলিশার্স, কোলকাতা, সেপ্টেম্বর ১৯৮৮, পৃষ্ঠা ৩২২

২। ঈশ্বর পৃথিবী ভালবাসা, শিবরাম চক্রবর্তী, নবপত্র প্রকাশন, কোলকাতা, ১ বৈশাখ ১৪০১, পৃষ্ঠা ৩৪৮

৩। তদেব, পৃষ্ঠা - ৩৫১

৪। শিবরামদা — কাছের মানুষটি, চন্ডী লাহিড়ী, কথাসাহিত্য পত্রিকা, ৫৪ বর্ষ ৯ সংখ্যা, আষাঢ় ১৪১০, পৃষ্ঠা - ৩১

৫। পূর্বোক্ত ২ নং, পৃষ্ঠা - ৩৭৭

৬। সৃষ্টি সুখের উল্লাসে, অঞ্জন বেরা, ন্যাশনাল বুকএজেন্সি, কোলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৯, পৃষ্ঠা - ৬৫

৭। পূর্বোক্ত ২ নং, পৃষ্ঠা - ৩৫৬

৮। শিবরাম চক্রবর্তী কিভাবে লেখক হলেন, চণ্ডী লাহিড়ী, কোরক সাহিত্য পত্রিকা, প্রাক্ শারদ, ১৪১০, পৃষ্ঠা ১১৭

৯। পূর্বোক্ত ২ নং, পৃষ্ঠা - ৩৫৬

১০। শিবরাম চক্রবর্তী এবং বাংলা নাটক, বারিদবরণ ঘোষ, পূর্বোক্ত ৮ নং পত্রিকা, পৃষ্ঠা - ৩৭

১১। পূর্বোক্ত ৪ নং, পৃষ্ঠা - ৩০ এবং শিবরামের পিছনের শিবরাম, চণ্ডী লাহিড়ী, কোরক সাহিত্য পত্রিকা, কোলকাতা বইমেলা ১৯৯০, পৃষ্ঠা - ৪১

১২। পূর্বোক্ত ২ নং, পৃষ্ঠা - ৩৪৮

চুটকি রচনাকার শিবরাম

১। বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস, অজিত দত্ত, জিজ্ঞাসা, কোলকাতা প্রথম সংস্করণ ভাদ্র ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা - ৪২১

২। কবিতা সংগ্রহ, সত্যেন্দ্র নাথ দত্ত, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, প্রথম প্রকাশ ২০ মে ১৯৮৮, পৃষ্ঠা - ২৮৮

৩। আনন্দসঙ্গী ১ প্রবন্ধ, আনন্দ বাজার পত্রিকা ১৩২৮ - ১৪০৩, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কোলকাতা, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০০১, পৃষ্ঠা - ১৫১

৪। পূর্বোক্ত ১ নং, পৃষ্ঠা - ৩৪৯ - ৩৫০

৫। ঈশ্বর পৃথিবী ভালবাসা, শিবরাম চক্রবর্তী, নবপত্র প্রকাশন, কোলকাতা, প্রথম নবপত্র প্রকাশ ১ বৈশাখ ১৪০১, পৃষ্ঠা - ৪২৬

৬। তদেব, পৃষ্ঠা - ৩৪৯

৭। তদেব, পৃষ্ঠা - ৪৩২

৮। যষ্টি-মধু পত্রিকা, শিব্রাম শ্রদ্ধার্ঘ, জানুয়ারি - মার্চ ১৯৮১, পৃষ্ঠা - ১০। শরৎচন্দ্রের কুকুরটির নাম জলধর সেন (মহাপ্রাণ শরৎচন্দ্র, শরৎ স্মৃতি, সাহিত্যম্), সবিতেন্দ্রনাথ রায় (আমার দেখা শিবরাম চক্রবর্তী, কোরক সাহিত্য পত্রিকা, প্রাক্‌শারদ ১৪১০) প্রমুখেরা 'ভেলু' বলে উল্লেখ করেছেন।

৯। আমার দেখা শিবরাম চক্রবর্তী, সবিতেন্দ্রনাথ রায়, কোরক সাহিত্য পত্রিকা, প্রাক্ শারদ, ১৪১০, পৃষ্ঠা - ১৫০

১০। পূর্বোক্ত ৫ নং, পৃষ্ঠা - ৪২৬

১১। ১৩৪, মুক্তারামবাবু স্ট্রিটের সেই রসিক লেখক, শতদল গোস্বামী, দেশ, ৪ জুলাই ১৯৮৭, পৃষ্ঠা - ৫৪

১২। পূর্বোক্ত ৩ নং, পৃষ্ঠা -১৫১

১৩। শিবরাম শতবর্ষে, কথাসাহিত্য, জুলাই - ২০০৩, পৃষ্ঠা - ৮১

১৪। তাঁকে বারবার ফিরে ....., পূর্বোক্ত ১৪ নং, পৃষ্ঠা - ৫৯

১৫। পূর্বোক্ত ৩ নং, পৃষ্ঠা - ১৫১